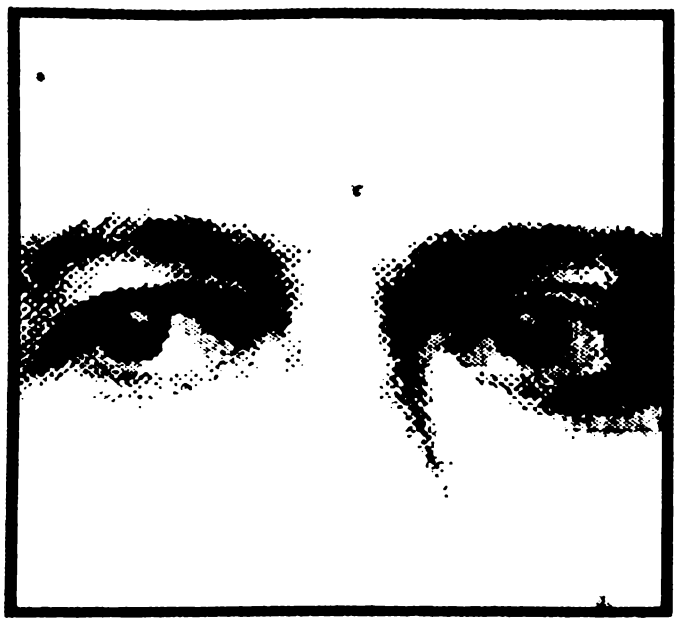
মানুষ

জীবনানন্দ

লাবণ্য দাশ





পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছি। হস্টেলে থাকি। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম জেঠামশাই বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন। পরদিন ক্লাশে অনেক পড়া, কাজেই মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম।

আগের দিন বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় কাদা জমেছে। আমি সেই কাদার ভিঁতর দিয়েই হেঁটে চলেছি। ফলে আমার শাড়ীর পাড় আর জুতোর রং দুয়েরই চেহারা একেবারে অন্য রকম। সেই অবস্থায় বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

মাথায় লম্বা বেণী, কোমরে আঁচল শক্ত করে জড়ান। পায়ে আর শাড়ীর পাড়ে কাদা। আমার দিদি তো (বেথুন কলেজে বি. এ. পড়ে। কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় এসেছে) আমাকে দেখে হেসেই অস্থির। আমি চটে গিয়ে বললাম, 'হাসি থামিয়ে এখন দয়া করে কিছু খেতে দিয়ে বাধিত কর।'

এমন সময় জেঠামশাই দোতলা থেকে হাঁক দিয়ে বললেন, 'মা লাবণ, কয়েকখানা লুচি নিয়ে এস তো!'

দিদি লুচির পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েই হাসি চাপতে দূরে সরে গেল। আমিও সেটা নিয়ে দুম্‌দাম শব্দ করতে করতে উপরে চলে গেলাম।

জেঠামশাইকে ঝাঁঝের সঙ্গে কি একটা বলতে যাব, তাকিয়ে দেখি সেখানে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

জেঠামশাই আমাকে বললেন, 'এই যে মা, এস আলাপ করিয়ে দি। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। দিল্লী থেকে এসেছেন।'

আমার তখন রাগের বদলে হাসির পালা। ছোটবেলা থেকে বেশ ভালভাবেই হাসিটি আয়ত্ত করেছিলাম। হাসি সামলাতে না পেরে ভদ্রলোকের দিকে পিছন ফিরেই একটা টুলের উপরে বসে পড়লাম।

জেঠামশাই বারবারই বলতে লাগলেন, 'ওকি, পিছন ফিরে বসেছ কেন? ঠিক হয়ে বস। বাড়িতে অতিথি এলে ঠিকভাবে আপ্যায়ন না করাটা খুব অন্যায়। ইনি তোমাকে কি ভাবছেন?'

ইনি নামক ব্যক্তিটি আমাকে যাই-ই ভাবুন না কেন, ঠিক হযে বসব কি-আমি তখন আমার হাসি সামলাতেই ব্যস্ত। যাই হোক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আমি তাঁর দিকে ফিরে বসলাম। কিন্তু অসীম ধৈর্য ভদ্রলোকটির। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না ফিরলাম, তিনি চুপ করেই বসে রইলেন।

তাঁর দিকে ফেরার পরে তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করলেন। 'আপনার নাম কি? আই এ-তে কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন এবং কোনটি আপনার বেশী পছন্দ।'

কোনও মতে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিয়ে ভদ্রলোককে কিছু না বলেই উঠে নীচে দৌড় দিলাম। রান্নাঘরে ঢুকেই দিদিকে গুম গুম শব্দে কিল মারতে আরম্ভ করলাম। দিদি আমার হাত দুখানা শক্ত করে ধরে রেখে বলল, 'তোর হ'ল কি?'

আমি আরও রেগে গেলাম। 'আমার কেন হ'তে যাবে? হয়েছে তোমাদের। আজ তোমরা আরম্ভ করেছ কি? ঐ ভদ্রলোকটি কে, আর আমাকে সাত সকালে ডেকে পাঠাবারই বা কারণ কি?' দিদি তখন 'আমি কি জানি? ভদ্রলোকটির খবর তো তোরই রাখবার কথা।' বলেই অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জেঠামশাই সেই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে নিচে নেমে বাইরের দিকে চলে গেলেন। আমি তাঁদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম।

দুপুরবেলা জেঠামশাই আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, লাবণ মা, সকালের ভদ্রলোকটিকে তোমার কেমন লাগল?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'উনি এসেছিলেন কেন?' উত্তরে জেঠামশাই বললেন, 'তাহলে বলি শোন। উনি দিল্লীর রামযশ কলেজের একজন অধ্যাপক। তোমাকে দেখতে

এসেছিলেন।' আমি তখন পরিস্কার, জানিয়ে দিলাম যে বি-এ পাশ না করে বিয়ের কথা ভাববই না।

ছেলেবেলায় মাত্র তিন মাসের তফাতে বাবা, মা দুজনকেই হারিয়েছিলাম বলে আমাদের অকৃতদার জেঠামশাই (অমৃতলাল গুপ্ত) তাঁর সবটুকু স্নেহ ঢেলে দুজনের জায়গাই পূর্ণ করতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন, 'তুমি যে বিয়ে করতে চাইছ না, আমি চোখ বুজলে তোমাকে কে দেখবে? তোমার দিদির বিয়ের কথা চলছে। হয়ত শিগ্‌গিরই, ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ছোট বোনটি খুবই ছোট। তার বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তোমার জন্যই আমার এখন চিন্তা। তাছাড়া-উনি তো তোমাকে পড়াতে রাজী আছেন। তাহলে তোমার বিয়েতে আপত্তি করার কি আছে?'

সত্যিই তো, বাবা-মা নেই। দিদির বিয়েও ঠিক হচ্ছে। এখন আমার বিয়ে হয়ে গেলেই জেঠামশাই দায়মুক্ত হবেন। অতএব মত আমাকে দিতেই হবে। তবুও শেষবারের মত বললাম, 'ভদ্রলোকের মত না জেনেই-আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?' তখন জেঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'তিনি সকালে তোমাকে দেখেই মত দিয়েছেন।'

আমার তখন অবাক হবার পালা। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি-কত রকম ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে তবে মেয়েকে বরপক্ষীয় লোকের সামনে দাঁড় করাতে হয়; তাঁরা হাজার রকম প্রশ্ন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে তবেই মতামত দেন। মেয়েদের সে এক ভীতিজনক অবস্থা। কিন্তু আমার বেলা!

সে যাই হোক, ২৬ শে বৈশাখ (৯ই মে) শুক্রবার (শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে) বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। কবির কবিত্ব শক্তির কোন রকম পরিচয় তখনও আমরা পাইনি। আমাদের কাছে তিনি অধ্যাপক হিসেবেই পরিচিত হলেন।

বিয়ে ঠিক হবার পরে কেন জানি না মা-বাবার কথা খুব বেশী করে মনে হতে লাগল। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আর আমার মনে কতটুকু? বড় হয়ে আমার দিদিমার মুখে শুনেই যেটুকু ধারণা।

আমার বাবা, রোহিণীকুমার গুপ্ত ছিলেন খুলনার বৈদ্যপ্রধান অঞ্চল সেনহাটির কুলীন বৈদ্য সন্তান। আর আমার মা যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামের তারাপ্রসন্ন সেনের একমাত্র মেয়ে সরযু গুপ্ত (সেন)।

সেন রাজাদের আমলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যে আটজনকে কুলীন বলে চিহ্নিত করেন, তাঁদের মধ্যে বৈদ্য বংশের কাশ্যপ গোত্রীয় কায়ু একজন। তাঁর উপাধি ছিল গুপ্ত। কায়ু গুপ্তের ছেলে বনমালী সেনহাটিতে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেনহাটি সর্বপ্রধান কুলস্থান বলেই প্রসিদ্ধ, আমার বাবা রোহিণীকুমার গুপ্ত এই বংশেরই সন্তান। বাবার ঠাকুমায়ের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজার দেওয়ান। রাজার কাছ থেকে তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তি পেয়েছিলেন। বাবার মুখে শুনেছি, বাখরগঞ্জ জেলার সুবিখ্যাত 'দুর্গা সরোবর' নামে প্রকাণ্ড দীঘিটি তিনিই তৈরি করিয়েছিলেন। এই সরোবরের কথা আজও সেখানকার প্রতিটি গ্রামের লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

ভগবান আমার বাবা-মা দু'জনকে অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়ে। গল্প শুনেছি-তিনি মুরগীর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, বাড়িতে আনতেও দিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এবং তাঁর স্বভাবটি ছিল কঠোর ও কোমলের অপূর্ব সমন্বয়।

আমার বাবা যেমনি ছিলেন স্ফূর্তিবাজ, তেমনি ছিল তার দরাজ মন। হিন্দু সন্তান, কোন রকম কুসংস্কারের ধার দিয়েও তিনি যেতেন না।

আমার বয়েস যখন সাত বছর কয়েক মাস, সেই সময় বাবা শ্রাবণে ও মা অগ্রহায়ণে বলতে গেলে একই সময়ে দু'জনে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। এর পরে পরে আমরা তিনটি বোন ও একটি ভাই আমাদের বড় জেঠামশাই-এর কাছে চলে আসি।

আমি গিরিডিতে উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখানকার বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। আমার দিদি প্রমীলা গুপ্ত (কমিশনার বি দে-র মেজো ছেলে ও সরোজনলিনী দত্তের ভাই-বি এন রেলওয়ের প্রাক্তন কমার্শিয়াল ট্রাফিক ম্যানেজার বসন্তকুমার দে-র স্ত্রী। তিনি কয়েক বছর হল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন) ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমাদের একমাত্র ভাই শান্তিবিন্দু গুপ্ত (মাদ্রাজে একটি বৃটিশ ফার্মের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) ও ছোট বোন নন্দিনী গুপ্তকে (দুর্গাপুরে বার্ন কোম্পানীর ওয়েলফেয়ার অফিসার নিশীথ ঘোষের স্ত্রী) গয়ায় মেজো জেঠামশাই বিহারীলাল গুপ্তের কাছে রাখা হল।

এইভাবেই শুরু হ'ল পিতৃমাতৃহীন আমাদের চারটি ভাই-বোনের জীবনযাত্রা। ভগবানই হয়ত হাল ধরেছিলেন-তাই তীরের দেখা পেলাম।

এবারে কবির পিতৃ ও মাতৃকুলের পরিচয় দিতে হলে আমাকে অতীতে ফিরে যেতে হয়।

কবির ঠাকুরদাদা সর্বানন্দ দাশের আদিনিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে। গ্রামটি সর্বনাশী পদ্মার করাল গ্রাসে পড়ায় তিনি বরিশালের শান্ত সুন্দর পরিবেশে এসে ঘর বাঁধলেন।

তাঁর ছিল সাত ছেলে ও চার মেয়ে। ছেলেরা হলেন-হরিচরণ, সত্যানন্দ, যোগানন্দ, অতুলানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। মেয়েদের মধ্যে একজন বাইশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। পাঞ্জাবনিবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বড় (তাঁদের এক ছেলে হলেন এইচ.এম.ভি-এর প্রাক্তন রেকর্ড অধিকর্তা পি কে সেন) এবং কোটালীপাড়ার সুগায়ক মনমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে মেজো মেয়ের বিয়ে হয়। সকলের ছোট স্নেহলতা দাশ বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি আজীবন কুমারী থেকে দেশের ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন।

সর্বানন্দের মেজো ছেলে সত্যানন্দই কবির বাবা। সৌম্যমূর্তি সত্যানন্দ একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অপার-অসীম।

খ্যাতনামা মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাশ হলেন জীবনানন্দের মা (গৈলার চন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বড় মেয়ে)।

বসন্তকালে ঋতুরাজের পায়ের ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মলয়পবন সবুজ বনানীর শ্যামলিমাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়। গাছের বুকে দেখা দেয় নতুন পাতা। নীলাকাশ থেকে ভেসে আসে পাখির আনন্দ লহরী। ফাল্গুন মাসের এইরকম একটি দিনেই বরিশালে জন্ম নিলেন কবি জীবনানন্দ।

বাবার ধ্যানগম্ভীর ভাব ও মায়ের অপার সহনশীলতা এই দুয়ের মিশ্রণে গঠিত হ'ল তাঁর চরিত্র। আমাদের দেশের প্রতিটি সন্তান কম কথা বলে কাজের ভিতর দিয়েই তার মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তুলুক-এই ছিল মায়ের ঐকান্তিক মনোবাসনা। তাঁর এই মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত কবিতায়।

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

কম কথা বলে, কাজে বড় হয়ে পৃথিবীতে তাঁর মায়ের কবিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন কবি জীবনানন্দ।

কবির বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে। জগদীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। বালকের শিক্ষানুরাগ সেই জ্ঞানী পুরুষকে মুগ্ধ করেছিল। তাই শিক্ষাব্যাপারে জীবনানন্দকে সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি জীবনের উন্নতির অনেকগুলি সোপানই অনায়াসে পার হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি এসে ভর্তি হলেন ব্রজমোহন কলেজে। স্বনামধন্য দেশভক্ত অশ্বিনীকুমারের বাবার নামেই কলেজটি স্থাপন করা হয়েছে। এই কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে আই এ পাশ করে তিনি কলকাতায় এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পড়তে।

১৯২১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে এম-এ পাশ করেন। কবির মুখে শুনেছি-পরীক্ষার কিছুদিন আগে তিনি দারুণ ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ বছর পরীক্ষা দিতে পারবেন না বলে তাঁর মাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধে থাকাতে মায়ের অনুমতি পেলেন না। বাধ্য হলেন পরীক্ষা দিতে-কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সম্মান আর পেলেন না তিনি।

এম-এ পাশ করার পরে তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সনে যখন তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজে ছিলেন, সেই সময়েই আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের ব্যাপারে তাঁর যে চারিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল, তার কিছুটা পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

আমাকে বিয়ে করার আগে এক ধনী ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। তিনি নিজেই মেয়ে দেখতে গেলেন-সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেসোমশাই (বরিশাল বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) রসরঞ্জন সেন।

পাত্রীপক্ষের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। মেসোমশাই ত' তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ। কবি কিন্তু সব সময় চুপ করেই রইলেন। এমন কি সালঙ্কারা মেয়েটিকে দেখে ও তাঁকে বিলেতে পাঠাবার প্রস্তাব শুনেও কোন কথাই বললেন না। বাড়ি ফেরার পরে মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে কি না সে কথা বারবার জিগ্যেস করেও কবির কাছ থেকে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

পরদিন দুপুরে আর একবার যাবার অনুরোধ জানিয়ে পাত্রীপক্ষ গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কবি তখনও যেন চিন্তা করছেন। মেসোমশাই তাঁকে যাবার জন্য তৈরি হতে বললেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'তুমি যাও। আমি যাব না।'

'সে কি কথা? বিয়ে করবি তুই, আর যাব আমি?' মেসোমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কবি কিন্তু ধীরভাবেই উত্তর দিলেন, 'যেখানে বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়াটাও আমি অনুচিত বলেই মনে করি।'

সেদিন মেসোমশাই-এর শত অনুরোধও তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

আবার এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা উদার ছিলেন, তার পরিচয় পেয়েছি আমার বিয়ের সময়। বিয়েতে একটিমাত্র আংটি ছাড়া-বোতাম, ঘড়ি অথবা আসবাব কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই আংটিটির জন্যই তিনি কত লজ্জিত কত কুণ্ঠিত। যেন মহা অপরাধে অপরাধী। বিয়ের পরে বরিশালে গিয়ে তাঁর বড় পিসীমাকে বলেছিলেন, 'তোমরা যদি বলে দিতে, তাহলে আমি নিজেই একটা আংটি কিনে নিয়ে যেতাম। আমার জন্য লাবণ্যর জেঠামশাইকে শুধু শুধু কতগুলো টাকা খরচ করতে হল। তাছাড়া বিয়ে করতে গেলে কিছু না কিছু পেতেই হবে– এ নিয়মই বা আছে কেন?'

কবির কথা শুনে বড়পিসীমা হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'সমাজের দোহাই দিচ্ছিস কেন? তোরা না নিলেই পারিস। কিন্তু আমি তো দেখি বিয়ের সময় বেশির ভাগ ছেলে বাপ-মায়ের অতি-বাধ্য হয়ে 'বাবা মায়ের কথার উপরে আমি কি কিছু বলতে পারি'– এই কথাই বলে বসে।'

কবি তাঁর এই তেজস্বিনী পিসীমাকে ভাল করেই চিনতেন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করলেন।

ফুলশয্যার রাতে তাঁর সর্বপ্রথম কথা হ'ল– 'আমি শুনেছি তুমি গাইতে পার। একটা গান শোনাবে?'

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনটা?'

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, গানটা যদি জান তবে সেটাই শোনাও।'

আমার এখনও মনে পড়ে, প্রথমবার গাইবার পরে তিনি আরও একবার গাইতে বললেন।

অনেকদিন পরে আমি একদিন হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, তুমি প্রথম দিনেই 'জীবন মরণের সীমানা' ছাড়াতে চেয়েছিলে কেন?'

তিনিও হেসেই উত্তর দিলেন, 'এই লাইন দুটোর অর্থ বল ত?'

"আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নামিয়া।"

আমি চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন আস্তে আস্তে বললেন, 'জীবনের শুভ আরম্ভেই তো এ গান গাওয়া উচিত এবং শোনাও উচিত।'



কবিতার খাতা ছিল কবির প্রাণ। সে-সব খাতা তিনি কাউকে ছুঁতেও দিতেন না। এমন কি তাঁর টেবিলের সামনে গেলেও তটস্থ হয়ে উঠতেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধে-আমার জন্য সেসব খাতার চরম দুর্গতিও তাঁকে হাসিমুখে সহ্য করতে দেখেছি।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরের কথা। যে যুগে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ দিকে-দিকে, দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, নিজেকে সেই যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য বিনয়, বাদল, দিনেশ, প্রীতি হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন– আমি সেই যুগেরই মেয়ে। কাজেই ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইনি।

একদিন সকালে হঠাৎ আমার নামে ওয়ারেন্ট ও বেশ কয়েকজন পুলিশ নিয়ে আই বি ডিপার্টমেন্টের তিনজন অফিসার আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। কবি তখন সামনের দিকের ঘরেই ছিলেন। একজন অফিসার তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'লাবণ্য দাশগুপ্ত কার নাম?'

কবি উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রীর নাম?'

অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'তাঁর নামে ওয়ারেন্ট আছে। আপনি কয়েকজন ভদ্রলোক ডাকুন। আমরা ঘর সার্চ করব।'

কবি নিঃশব্দে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলেন। দুটি ঘণ্টা ধরে পুলিশের তাণ্ডব নৃত্যের ফলে তাঁর অতিপ্রিয় কবিতার খাতাগুলির যা অবস্থা হয়েছিল তা দেখে আমার মত কাব্যরস-বঞ্চিত মানুষের চোখেও জল এসে গিয়েছিল।

শুধু সার্চ করেই অফিসাররা থামলেন না। জেরার জন্য আমাকেও তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। তাঁরা একটা নাম জানবার জন্য অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এতসব গোলমালের মধ্যেও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। যিনি পদস্থ অফিসার, তিনি আমার পড়ার টেবিলের উপরে বসে কবির 'ঝরাপালক' নামে কবিতার বইখানি পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন– মাঝে মাঝে কবির দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেনও। যিনি প্রশ্ন করছিলেন, তিনি আমার খাটের উপরে বসেছিলেন।

সার্চ ক'রতে ক'রতে হঠাৎ আয়র্ল্যান্ড বিপ্লবের একখানা ইতিহাস পাওয়া গেল। বইখানা দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম। সেখানা তো আমার নয়-ই–এমন কি কে এনেছে তাও জানি না। বই পেয়ে খাটের উপরের জন কবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনার স্ত্রী রীতিমত বিপ্লববাদীদের দলে যোগ দিয়েছেন।' কথাটা শুনে কবি কিছুক্ষণ হতবাক হয়েই রইলেন। পরে, আস্তে আস্তে বললেন– 'আমার স্ত্রীর বিপ্লবের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ নেই।'

'মশাই, এরা ঢাকার মেয়ে। এদের কতটুকু আপনি চেনেন?' মাথা উঁচু করে গর্বভরে অফিসার উত্তর দিলেন।

এ-কথায় কবির সমস্ত মুখে একটা ম্লান আভা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ব্যথাভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। টেবিলের উপরের জনও আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। খাটের আরোহী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বই কি আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর আপনার কি আর কিছু বলার আছে?' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক হাতে ওয়ারেন্ট ও অন্য হাতে কলম ধরলেন।

কবি তখনও নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি এবারে গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলাম, 'বলবার আমার এইটুকুই আছে যে ওখানা বি এ ক্লাসে ইতিহাসের রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইচ্ছে হলে বি এম কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেশ রাগের সঙ্গেই অফিসারটি বললেন, 'বি এ ক্লাসের বই আপনার ক্লাসে কেন? তাছাড়া এতরকম গল্পের বই থাকতে বিদ্রোহের ইতিহাসই বা পড়েন কেন?'

আমি তখন হেসে ফেলেছি। হাসতে হাসতেই উত্তর দিলাম, 'আই এ-তে আমার ইতিহাস আছে। তাছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও বাংলার ছেলেমেয়েকে পড়তে হয় বলেই জানি। তবে আপনি যদি সঠিক খবর

জানতে চান, তাহলে অবিশ্যি ইতিহাসের অধ্যাপককেই ডেকে আনতে হয়।'

আমার কথা শুনে অফিসারটি সম্ভবত অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর মুখে বেশ একটা থমথমে ভাব দেখা গেল। কিন্তু টেবিলের উপরের জন হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, 'ওহে, আর কেন? অনেকভাবেই তো পরীক্ষা করলে। এবারে nil লিখে দিয়ে উঠে পড়।'

কবির মুখের ম্লান আভা সরে গিয়ে ততক্ষণে সেখানেও হাসি ফুটে উঠেছে।

চলে যাবার সময় পদস্থ অফিসারটি পরমাগ্রহে কবির বইখানি চেয়ে নিলেন এবং সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন, 'আমাদের জন্য অনেক কষ্টই আজ আপনাকে ভোগ করতে হ'ল।'

পুলিশের হাঙ্গামার জন্য অনেকেই আমার উপর বিরক্ত হলেন। কিন্তু কবিকে দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিরক্ত তো তিনি হলেনই না, বরং আমি যে দেশের কথা চিন্তা করি সেজন্য তিনি গর্বই বোধ করলেন। কারো স্বাধীনতা খর্ব করতে অথবা ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে আমি তাঁকে কোনদিনও দেখিনি। তিনি সব সময়েই বলতেন, 'বড় হয়ে যে যেটা উচিত বলে মনে করবে সে সেটাই করবে। কারো তাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়।'

এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনা বলি।

আমি যেবারে বি.এ পরীক্ষা দিলাম, সেবারে কবি সেই কলেজেই (বরিশালে-ব্রজমোহন কলেজ) ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে ছিলেন। ইতিহাস পরীক্ষার দিন শরীর খুব খারাপ বোধ হওয়াতে আমি পরীক্ষা দেব না স্থির করে বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন অধ্যাপক আমাকে বাধা দেন। এমন কি আমাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাবার জন্য কবিকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁর সামনেই আমি বললাম, 'আমি পরীক্ষা দেব না, বাড়ি যাব।' তিনি আমার মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে না থাকলে পরীক্ষা দিও না। শরীর বেশি খারাপ লাগলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।' কথাটা বলেই মুহূর্ত মাত্র সেখানে অপেক্ষা না করে নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র ঘোষ কবির উপর ভীষণ চটে গিয়ে বলেই ফেললেন, 'বাড়ি যাবার অনুমতি তুমি দিতে পার, কিন্তু আমি কিছুতেই দেব না।' তাঁরই ব্যবস্থায় আমি পরীক্ষা দিতে বাধ্য হলাম। তিনি যদি সেদিন আমার জন্য অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে

এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ আর পেতামই না।

আমরা যে সময়ে বরিশালে ছিলাম, তখন সেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা তো ছিলই না বরং পর্দাপ্রথার প্রচলনই বেশি ছিল। আমাকে কলেজে যেতে হ'ত ঘোড়ার গাড়ির দরজা বন্ধ করে। বাড়িতে কোনও ভদ্রলোক এলে তাঁর সামনে যাওয়া বা কথা বলার অধিকার আমার ছিল না। কারণ, এসব ব্যাপারে সমাজে খুবই সমালোচনা হত। কিন্তু কবি উৎসাহ যুগিয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে দিতেন বলেই আমি অনেক কাজেই এগিয়ে যেতে পেরেছি।

একবার আমাদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। খবর পেয়ে তো দারোগা এসে হাজির। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলবে কে–সেটাই হল সমস্যা। আমার শ্বশুরমশাই বুড়ো মানুষ, কাজেই তিনি এ সব কথা-বার্তায় থাকবেন না। কবি তাঁর লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তার অমূল্য সময়ের একটুখানিও নষ্ট করতে রাজী নন। তবুও আমার শাশুড়ী কবিকেই গিয়ে বললেন, 'দারোগা এসে বসে আছেন। তুই একবার যা। বাড়িতে আর কোন ছেলে নেই। তুই না গেলে কথাবার্তা বলবে কে?'

'কেন? লাবণ্য কোথায়?'–লিখতে লিখতেই কবি উত্তর দিলেন।

উত্তর শুনে আমার শাশুড়ী বিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন। 'ওমা, সে কি কথা! বাড়ির বউ দারোগার সঙ্গে কথা বলবে? কেন, তুই কি এদেশের রীতি-নীতির খবর রাখিস না?'

'দেখছি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি। তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের দেশে পাবার উপায় নেই। তা বেশ তো, সে না পারলে, তুমি নিজেই যাও, আমাকে আর বিরক্ত ক'র না।'–কথাগুলো শেষ করেই তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

শাশুড়ী তখন বাধ্য হলেন আমাকে পাঠাতে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে খবরাখবর দেওয়া, যা কিছু আলোচনা করা সবই আমি করলাম।

আগেই বলেছি, আমি শৈশব কাটিয়েছি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল গিরিডিতে। শালবনের আলো-আঁধারি ছায়াঘেরা পথে ঘুরে বেড়িয়ে বর্ষায় উচ্ছল-যৌবনা পাহাড়ী নদী উশ্রীর রূপোলী ধারায় পা ডুবিয়ে এবং ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দৌড়ঝাঁপ করেই আমার দিন কেটেছে। বন্ধন কাকে বলে জানতাম না। তাই বরিশালে প্রতিপদে পরাধীনতার শিকল ফাঁস হয়েই আমার গলা আটকে ধরল। টানাটানি করে সে ফাঁস আলগা করতে

গিয়ে চোখের জলেই ভেসেছি, কিন্তু তাকে তার জায়গা থেকে একটুও নড়াতে পারিনি।

আমার সে পরাজয়ের গ্লানি কবির চোখে ধরা পড়েছে বইকি। তিনি তখন এই কথা বলেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন–'তুমি চোখের জল ফেলো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যেদিন বরিশালের এই আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারব, আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া। আজ তুমি যতটা কষ্ট সহ্য করছ, ভবিষ্যতে ঠিক সেই পরিমাণেই স্বাধীনভাবে তুমি চলতে পারবে। তখন যদি কেউ বাধা দিতে আসে, বোঝাপড়া হবে আমার সঙ্গে।' তাঁর সে কথা তিনি সত্যিই রেখেছিলেন।

১৯৫৪ সনের ১২ই মার্চ আমি যখন 'চলোর্মি' ক্লাব থেকে রঙমহলে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' বইতে মেজো বউরানীর পার্ট করলাম, তখন বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল বৈকি। কেউ কেউ এ মন্তব্যও করেছিলেন, 'তুমি কি শেষে তোমার বউকে স্টেজে নামাবে নাকি?' উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'আমি এখনও মরিনি। আমার স্ত্রী কি করবেন না করবেন সে দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিলেই সুখী হব। আর, এ তো সামান্য একটা ক্লাব থেকে থিয়েটার। যদি তাঁর ইচ্ছে থাকে–সিনেমাতে অ্যাকটিং ক'রতে দিতেও আমার আপত্তি হবে না।'

কবির সেই বজ্রগম্ভীর স্বর শুনে আমি নিজেও সেদিন কম অবাক হইনি। তাঁর সে চেহারা চোখ বন্ধ করলে আজও আমার সামনে ভেসে ওঠে।

একটি জায়গায় শুধু তাঁর ভীষণ আপত্তি ছিল। সেটি হচ্ছে–অসুস্থ শরীরে আমার পড়াশুনো করা।

বঙ্গ বিভাগের পরে যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলাম, তখন পড়াশুনো অথবা চাকরী–দুটোর একটা করব বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু কোনটাতেই কবির মত পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে আমাকে কিছুদিন চুপ করে ঘরে বসেই কাটাতে হ'ল। শেষে আর বসে থাকতে না পেরে আমি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি টি পড়তে গেলাম।

কিছুদিন আগেই 'অ্যানজাইনা' রোগটি আমার শরীরের উপর দিয়ে তার প্রথম আক্রমণপর্ব চালিয়ে গিয়েছে। জের তখনও ভালভাবে কাটেনি। কাজেই, কবির বাধা ঠেলে ভর্তি হবার কাজটা খুব সহজ হয়নি।

অসুখটা হবার ফলে তাঁর একটা ধারণা হয়েছিল যে, আমার পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎই একদিন সকলকে ফাঁকি দিয়ে আমি চলে যাব। সেজন্য সর্বদাই বলতেন, 'তুমি রাস্তাঘাটে যত খুশী দৌড়ে বেড়াও–আপত্তি করব না। শুধু গলায় একটা চাকতি ঝুলিয়ে রেখো।'

আমি যখন চটে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি তখন আর একদিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলতেন– 'না, চাকতিটা থাকলে মর্গ থেকে চিনে বে'র করতে অসুবিধে হবে না। এই আর কি।'

কথাটা শুনে আমি আর কিছুই বলতে পারতাম না– শুধু তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকতাম। আজ কেবলই মনে হয়–আমাকে মর্গ থেকে আনবার ভয়েই তিনি তাড়াতাড়ি আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন?

যাই হোক–বি টি কলেজে ভর্তি তো হলাম। কোর্সটা হ'ল ন' মাসের। কিন্তু চার মাসেরও বেশি আমি দুর্বলতার জন্য বিছানাতেই শুয়ে রইলাম। সুস্থ হয়ে যেদিন কলেজে রওনা হচ্ছি–কবি গম্ভীরভাবে বললেন, 'শোন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? যদি কলেজ যাও, তবে আমি এখুনি প্রিন্সিপালের কাছে চিঠি পাঠাব কলেজের খাতা থেকে তোমার নামটা বাদ দেবার জন্য। তিনি যদি আমার কথা না শোনেন, তবে আমি তাঁর নামে কেস করব।'

আমার তখন মনে দারুন চিন্তা–এত ক্ষতি হল, কী করে পাস ক'রব। কাজেই তাঁর কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রেগে গিয়ে বললাম–'বেশ তো চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু তার আগে তোমার কবিতার খাতা সামলিও। আমার নাম কাটার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কবিতার খাতাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' কথা শেষ করেই আমি কলেজে চলে গেলাম। যতক্ষণ দেখা গেল–দেখলাম, তিনি আমার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কবিকে নিয়ে মুশকিল বাধল রেজাল্ট বের হবার দিন। সেদিন কোথায় গেল তাঁর কবিতা লেখা আর কোথায়ই বা কাজকর্ম। সকাল থেকে কেবলই বারান্দায় অস্থিরভাবে ঘুরছেন আর বলছেন–'দেখ, তুমি কিন্তু বেশী কান্নাকাটি করতে পারবে না। একে তো তোমার দুর্বল শরীর, তার উপরে যদি কাঁদতে শুরু কর– তবে তোমাকে বাঁচানই যাবে না।'

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছি– কাঁদব কেন? কি এমন কারণ ঘটল, যার জন্য আমাকে কাঁদতে হবে?

তিনি আমতা আমতা করে বললেন– 'এই, বলছিলাম আর কি, আজ তো রেজাল্ট বের হবে। তাছাড়া এত অসুখে ভুগে তুমি তো আর পড়াশুনা করবার সময় পাওনি– পাস করাটা কি তোমার পক্ষে সম্ভবপর?'

'এ তো আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়লাম। স্ত্রীর যাতে নাম হয়, লোকে তার জন্য কত কিছু করে। তোমাকে দিয়ে তো সে সব কিছু হলই না। উল্টো পরীক্ষা দেবার পর থেকেই শুরু করেছ যে আমি ফেল করবই। পাস করতে পারি–এ কথাটা ভুলেও একবার মনে করতে পার না?' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কথাগুলি কবিকে শুনিয়ে দিলাম।

আমার কথা শুনে তিনি খুব দুঃখের সঙ্গেই বললেন, 'শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এতবড় মিথ্যে কথাটা তোমাকে বলি কি করে? যদি কলেজটাও পুরোপুরি অ্যাটেন্ড করতে পারতে, তাহলেও না হয় পাসের কথা ভাবা যেত। সবকিছু জেনেও আমি কেমন করে ভাবব যে, তুমি পাস করবে?'

সমস্তটা দিন তিনি নিজেও কোন কাজ করলেন না, আমাকেও রেহাই দিলেন না। পাস করব না ভেবে আমি নিজে যে একটু মন খারাপ করব সে সুযোগই পেলাম না।

সেই সময়ে আমার ছোট-জা শ্রীমতী নলিনী দাশ (এখন বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল) ডেভিড হেয়ারে অধ্যাপিকার পদে ছিলেন। বিকেলের দিকে তিনি আমার নামে একখানি চিঠি দিয়ে একটি লোককে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। কবি দৌড়ে এসে চিঠিখানা ছোঁ মেরে নিয়েই লোকটিকে বিদায় করে দিলেন। তারপরে–নিজেও চিঠি খুলবেন না–আমার হাতেও দেবেন না। কবির অবস্থা দেখে আমি হাসব কি কাঁদব কিছুই বুঝতে পারছি না।

অনেকক্ষণ পরে তিনি চিঠিটা একটুখানি খুলে দেখেই হাসিমুখে আমার হাতে দিলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল যেন পরীক্ষাটা আগে দিইনি, এতক্ষণ ধরে কবির সামনে বসেই দিলাম।

তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম চিঠিতে আর যা-ই থাক না কেন, ফেলের সংবাদ নেই। থাকলে কবিকে সামলানোই দায় হত। চিঠি পড়ার পরে আবার তাঁর উল্টো কথা শুরু হল। 'হ্যাঁ, তুমি কি যাদু জান? তা না হলে–' ইত্যাদি ইত্যাদি।

• পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের আগে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবি যে অদ্ভুত মনোবল, অপরিসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন–তা সত্যিই অতুলনীয়। আমার দেওর (কবির খুড়তুতো ভাই) ডাক্তার অমল দাশ আমাকে কতবার বলেছে, 'বৌদি, দাদা যে কি সাংঘাতিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করছেন সেটা মানুষের কল্পনাতীত।' কিন্তু এই মানুষই আমাদের ব্যথা বেদনায় কতটা ব্যাকুল হয়ে পড়তেন–আমাদের সামান্য অসুখে কতখানি বিচলিত হতেন, তারই দু-একটি ঘটনা বলছি।

তখন আমরা বরিশালে ছিলাম। আমার ছেলে সমর (খোকন) সবে দু'বছরের শিশু। একদিন আমাদের পাশের বাড়িতে তারই সমবয়েসী এক খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে খেলা করবার সময় পড়ে গিয়ে তার মাথার অনেকটা জায়গাই কেটে যায়। সে বাড়ির ঝি এসে আমাকে খবরটা দিতেই আমি ছুটে সেখানে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি সমর বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মাথার রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে ছোট্ট দু'খানি হাত দিয়ে রক্ত ঠেকাতে গিয়ে সে হাঁফিয়ে উঠছে। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়েই এক ছুটে সোজা আমাদের স্নানের ঘরে ঢুকে তার মাথাটা নীচু করে ধরে অনবরত জল ঢালতে লাগলাম। মাথা নিচের দিকে করাতে ছেলেও তার স্বরে চীৎকার শুরু করল। হঠাৎ পিছন থেকে কবির আর্তস্বর শুনতে পেলাম, 'মরে যাবে, ছেলেটা এখুনি মরে যাবে। শিগ্‌গির ওর মাথা সোজা কর। তোমাকে এ ডাক্তারি কে শেখাল।'

আমি মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম–আমার ডাক্তারি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি আসল ডাক্তারকে ডাকার ব্যবস্থা কর।'

আমার কথা শুনতে পেয়ে বাড়ির চাকরটি দৌড়ে গিয়ে কবির বাল্যবন্ধু ডাক্তার অমল ঘোষকে ডেকে নিয়ে এল। ইঁটের আঘাতে মাথা কেটেছে শুনে প্রথমেই তিনি ইঁটের কুঁচি আছে কিনা সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপরে কবিকে বললেন, 'সেলাই করতে হবে। তুই খোকনকে কোলে নিয়ে বোস।'

ব্যাস–কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কবি ঘর থেকে উধাও। তাঁকে কোথাও দেখতেই পাওয়া গেল না। তখন আমিই ছেলেকে কোলে নিয়ে বসলাম। ডাক্তার সেলাই করলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে দেখলাম–কবি জানালা দিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে ডাক্তারকে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করছেন,

–'কখন সেলাই করবি?' ডাক্তারও হেসে উত্তর দিলেন, 'সূচসুতো নিয়ে তোর অপেক্ষাতেই বসে আছি। তুই এলেই সেলাই করে ফেলব।' ছেলের মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে তবে কবি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর এই দুর্বলতার জন্য অবিশ্যি তাঁকে অনেক কথাই শুনতে হল, কিন্তু ছেলের দিকে তাকিয়ে সব কিছুই তিনি হাসিমুখে মেনে নিলেন।

আমার মেয়ে মঞ্জুশ্রী যখন খুব ছোট, তখন তার একবার আমাশা হয়েছিল। কিছুতেই সারে না। এদিকে মেয়ে তো দারুন দুর্বল হয়ে পড়ল। শেষে এমন হল যে কিছুতেই আর বিছানায় শুতে চায় না। কেবলই বলত– 'কোলে শুয়ে ঘুরব।' সে কাজ আমার দ্বারা হত না। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি কবির ধৈর্য দেখে। মেয়েকে কাঁধের উপরে শুইয়ে রাতের পর রাত তিনি ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতেন। একটু ক্লান্তি বোধ করতেও কোনদিন দেখিনি।

এসব কথা লিখতে গিয়ে আজ কেবলি মনে হচ্ছে–আমাদের সামান্য অসুখেও যাঁর এত চিন্তা ছিল, আমাদের ব্যথা বেদনায় যিনি এতটা অধীর হয়ে পড়তেন–তিনি আজ কোথায়? সত্যিই কি তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাদের একেবারেই ভুলে যেতে পেরেছেন? না-কি অন্য কোথাও জন্ম নিয়েছেন?

কিন্তু তাঁর আবার জন্মাবার কথা চিন্তা করতে যাওয়াটাও আমার পক্ষে অসহ্য। কিছুদিন আগে কবির এক ছাত্র আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা প্ল্যানচেটের সাহায্যে স্যারের আত্মা এনেছিলাম। পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছে তিনি প্রকাশ করেছেন।'

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমরা সত্যিই বড় বেশী স্বার্থপর। আমাদের প্রিয়জন পরলোকে চলে গেলেও আমরা তাঁদের মন থেকে বিদায় দিতে পারি না। কল্পনার ভিতরেও যতক্ষণ পারা যায় আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। তাঁরা অন্যরূপে আবার পৃথিবীতে আসবেন–কথাটা ভাবতে গেলেই যে আমাদের সে কল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে, তাইতো আমরা সে চিন্তা মনেও আনতে পারি না।



কবিকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে আমি খুব কমই দেখেছি। কিন্তু যদি কখনও সামান্য একটু জ্বরও হত, তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। শুধু তাই-ই নয়–চাইতেন যে সবাই এসে তাঁর কাছে বসে থাকুক। সেজন্যে বিছানায় শুয়েই বলতে আরম্ভ করতেন– 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস–আমার কাছে আয়। আমার শরীর যেন কেমন করছে–অবস্থা মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না–কতক্ষণ আছি কে জানে?'

তাঁর কথা শুনে সবাই (সবাই অর্থে আমি এবং আমার ছেলে সমর) যদি ছুটে তাঁর কাছে না যেতাম, তাহলেই তাঁর রাগ হয়ে যেত।

তখন আমি শিশু বিদ্যাপীঠ নামে একটি সেকেন্ডারী স্কুলে সবে ঢুকেছি। একদিন রাত প্রায় ৯টার সময় বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় কবিকে বলতে শুনলাম, 'হ্যাঁরে খোকন, তোর মা কি বাড়ি ফিরেছেন?'

'খোকন' আমার ছেলের ডাক নাম। সে উত্তর দিল–'না।'

তিনি তখন বলতে শুরু করলেন–'তা ফিরবে কেন? এদিকে আমি যে জ্বরে পড়ে আছি–সেটা কে দেখে–কেই বা মুখে একটু জল দেয়?' বলেই মনে হল যেন সারাদিন রোদ-খাওয়া লেপখানাকে বেশ আরামের সঙ্গেই গায়ে জড়িয়ে পাশ ফিরলেন।

কবির কথা শোনার পরে আমি আর ঘরে ঢুকলাম না। নিঃশব্দে বেরিয়ে সোজা একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। কারণ আমি জানি যে কবির জ্বর হলেও সেটা অতি সামান্য। অ্যানাসিন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। একে তো শীতকাল, তাতে আবার বেশী রাত জেগে লেখাপড়ার কাজ করেছেন–তাতেই হয়ত শরীরটা বেশী খারাপ লাগছে।

শেষ পর্যন্ত দুটো অ্যানাসিন ট্যাবলেট নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। ট্যাবলেট ও জলের গ্লাস টেবিলে রেখে বললাম, 'ওষুধ রইল। ডাক্তার আজ বার্লি খেতে বলেছেন।'

কবি এতটার জন্য তৈরী ছিলেন না। আমি যে তাঁর কথা শুনে ফেলব সেটা তিনি ভাবতেই পারেননি। কাজেই চুপ করেই রইলেন।

আমি অন্য ঘরে বসেই শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম যে তিনি উঠে অ্যানাসিন খাচ্ছেন। খানিক বাদে আমি খোকনকে খেতে দেবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম। তাকে থালায় ভাত দিয়েছি, এমন সময় বারান্দা থেকে কবির স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম। –'এখন তো মনে হচ্ছে জ্বর আর নেই। গরম ভাত একটু ডিমের ঝোল দিয়ে খেলেও খাওয়া যেতে পারে। তখন কেন যে বেশী জ্বর বলে মনে হ'ল? না–অন্যায়টা তো আমারই। একটা মানুষ সারাদিন স্কুলে কাজ করে এসে সন্ধ্যেবেলা যদি একটু বেড়াতে না যায়, তবে তার শরীর টিকবে কি ক'রে?

আমি কিন্তু চুপ করেই রইলাম। কিছুক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। বোধহয় খাবার ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। তারপরেই দেখি খোকনকে ডাকতে ডাকতে খাবার জায়গায় এসে হাজির। ছেলেকে ডিম খেতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি থালা নিয়ে বসে পড়লেন। ডিম ছিল তাঁর অতি প্রিয় খাদ্য। ছেলেকে ডিম খেতে দেখলে তিনিও তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন এবং তার ভাগ থেকে কিছুটা ভেঙে মুখে দিতে তিলমাত্রও দ্বিধা বোধ করতেন না। সুতরাং তখন আর কি করি–ভাত তাঁকে দিতেই হল। আর তিনিও গরম ভাত ডিমের ঝোল দিয়ে খেয়ে তবে উঠলেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় আমার ছেলে-মেয়ে অথবা আমি কেউই কোনদিন পেন্সিল কেটে নিয়েছি অথবা কলমে কালি ভরেছি বলে তো মনে পড়ে না। এসব কাজ কবি নিজেই করতেন। তাঁর কাজ ছিল নিখুঁত। চিহ্নস্বরূপ এখনও তাঁর হাতের কাটা একটি পেন্সিল আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। পেন্সিলটি দেখলে স্মৃতির আলোড়নে কত কথাই ভেসে আসে। জগতে জড় পদার্থের মূল্য কতটুকু! কিন্তু যার জন্য সেই জড় পদার্থ অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে–যাকে নিয়েই স্মৃতির আলোড়ন–থাকে না সেই মানুষ। ভাঙা-গড়ার কাজে বিধাতাপুরুষ মানুষের মন নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছেন। যে মনে চেতনা দিয়েছেন বলেই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব–আবার

সেই মনকেই ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে প্রিয়জনকে টেনে নিয়ে যেতে একটুও বাধছে না! বিধাতার এ কী খেলা!

কারো উপরে রাগ করে তিনি পাঁচ মিনিটও থাকতে পারতেন না। তাঁর ব্যবহারে অন্যে কষ্ট পাবে একথা বোধহয় তিনি ভাবতেই পারতেন না। কাজেই সে রাতের সেই মন্তব্যের জন্য তার পরদিন তিনি কিছুতেই স্থির হয়ে কাজে মন দিতে পারছিলেন না। আমিও গম্ভীর হয়েই রইলাম। এমন কি সন্ধ্যেবেলা বাইরেও বের হলাম না। একখানা বই হাতে নিয়ে খোকন যেখানে বসে পড়ছিল, সেখানেই বসে রইলাম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি বাইরে না বেরনোতে কবি কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছিলেন না। অথচ আমাকে কিন্তু বলতে সাহসও পাচ্ছেন না। হঠাৎ শুনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন– 'খোকন, কলকাতার সব সিনেমাই আজ বন্ধ নাকি রে?'

খোকনের বয়স তখন কম–নিতান্তই ছেলেমানুষ। সে তার বাবার অর্থ ধরতে না পেরেই উত্তর দিল–'না বাবা, সিনেমা তো চলছে। বন্ধ থাকবে কেন?'

কবি হেসে বললেন, 'তুই জানিস না। তোর মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আজ সব সিনেমা হলের দরজাই বন্ধ।'

তখন আর কি করি। আমিও হেসে ফেলেছি। আমার মুখে হাসি দেখে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন।

কবি যখন লেখার কাজ নিয়ে বসতেন, সে সময় কতদিন কতভাবে যে তাঁকে বিরক্ত করেছি, সে কথা বলে শেষ করা যায় না। এজন্য কিন্তু তাঁকে রাগ করতে কোনদিনই দেখিনি।

আমার একটা খারাপ অভ্যাস ছিল যে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় বানান সম্বন্ধে সন্দেহ হলে কষ্ট করে অভিধানের পাতা না উল্টিয়ে সোজা কবিকেই জিজ্ঞেস করতাম। স্বভাবে আমি চিরকাল কবির একেবারে উল্টো। তিনি ছিলেন ধীর, শান্ত। আর আমি ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার ধার দিয়েও যাই না। প্রায় সময়ই তিনি আমার অভিধানের কাজ করে দিতেন। ফলে তাঁর নিজের কাজে বাধা পড়ত। মাঝে মাঝে বলতেন, 'দেখ, তোমার যেসব শব্দ অথবা অর্থের দরকার সেগুলো একটা কাগজে লিখে আমার টেবিলে রেখে দিও। তাহলে তোমাকেও চেঁচিয়ে গলাব্যথা করতে হয় না আর আমারও সময় নষ্ট হবে না।'

মঞ্জুশ্রী ও সমরের কাছে কবি শুধু বাবাই ছিলেন না–তাদের বন্ধুও ছিলেন তিনি। তাই তাদের যত কথা যত গল্প সবই ছিল তাঁর সঙ্গে। লেখক শ্রীসুবোধ রায় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন। তিনি প্রায় রোজই আমাদের বাড়িতে এসে কবির সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে গল্পে বাবার সঙ্গী হিসেবে সমরও নিয়মিত-ভাবেই যোগ দিতো। খেয়ে দেয়ে তাঁরা গল্প করতে বসতেন। সুবোধবাবুও সে পাট চুকিয়েই আসতেন। কোন কোন দিন রাত প্রায় একটা বেজে যেত–তবুও তাঁদের গল্প শেষ হ'ত না। আমি এক ঘুম দিয়ে উঠে ছেলেকে তাড়া দিয়ে শুতে পাঠাবার চেষ্টা করলে সে দু-হাতে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত। আমি রাগ করলে সুবোধবাবু ও কবি দুজনেই হাসতেন।

তাঁদের আসরে শুধু যে মজার মজার গল্পই হত, তা নয়। সাহিত্যের আলোচনাও হত। ছোট ছেলে হয়েও সমর মন দিয়ে সেসব কথা শুনত। এমন কি মাঝে মাঝে সাধ্যমত নানারকম প্রশ্নও করত। কবি ও সুবোধবাবু দুজনেই যতটা পারতেন, তাকে বুঝিয়ে দিতেন। ছেলে যে সেসব কথায় কি স্বাদ পেত জানি না–মন দিয়ে বসে বসে শুনত। কোন কারণে যেদিন সুবোধবাবু না আসতে পারতেন, সেদিন সমরের মন খারাপ হয়ে যেত! সে তার বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কেবলি জিজ্ঞাসা করত–'বাবা, সুবোধ কাকা কখন আসবেন– কখন আমাদের গল্প হবে?'

ছেলের ম্লান মুখ দেখলে কবিও কোন কাজে মন দিতে পারতেন না। সবকিছু ফেলে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে বসতেন। বাবার রোজকার সঙ্গী হিসেবে ছেলেও ক্রমে সাহিত্যকে ভালবাসতে শিখল।

কোথাও যেতে হলে অথবা কোন কাজ শুরু করবার আগে তিনি প্রথমেই ছেলের মতামত জিগ্যেস করতেন। 'তুই কি বলিস?' ছেলে মত দিলে তিনি খুশী হয়ে সে কাজ করতেন। আমি হাসলে বলতেন–'বুড়ো হয়ে তো এই ছেলের উপরেই নির্ভর করতে হবে। এখন থেকেই তার তালিম নিচ্ছি'–কথাটা বলেই দুহাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরতেন।

ছোট ছেলের সিনেমা দেখা পছন্দ করতাম না বলে আমি সমরকে বিশেষ সিনেমায় যেতে দিতাম না। তবে, তার যেদিন যেতে ইচ্ছে হত, বাবাকে দিয়েই ব্যবস্থা করিয়ে নিত। বাবা ও ছেলে বুঝুক আর নাই বুঝুক–ব্যাপারটা কিন্তু আমার নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। কোন এক রবিবারের দুপুর হঠাৎ আমার চোখে পড়ল–সমর তার বাবার কানে কানে

ফিসফিস করে কি যেন বলছে। তিনি মাথা নাড়ছেন আর আমি যে ঘরে ছিলাম, সেদিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। পর মুহূর্তে সমর বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমি যেন কিছুই জানি না–এইরকম ভাব দেখিয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম–'খোকন কোথায়, তাকে দেখছি না যে?'

তিনি আর একদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন–'যাবে আবার কোথায়, কেন, তোমার কি দরকার? চাকরকে পাঠাও না।'

তাঁর কথার ধরনে আমি হেসে বললাম, 'তাকে তো কোথাও পাঠাতে চাইছি না। শুধু জানতে চাইছি সে কোথায় গেল।'

তখন তিনিও হেসে ফেলেছেন। হাসতে হাসতেই বললেন 'বাবা, তোমাকে কি ফাঁকি দেবার যো আছে? সে যেখানেই যাক আমাকে বলেই গেছে। তুমি আবার তাকে বকাবকি করতে যেও না।'

সন্ধ্যেবেলা দেখি কবি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন ইশারায় কি বলছেন। বুঝতে পারলাম ছেলে এসেছে। যাতে আমার চোখে না পড়ে তাই এই সতর্কতা। তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে খোকনকে জিগ্যেস করলাম, 'কি বই দেখলি?' ছেলে বুঝল যে আমি রাগ করিনি। তখন হাসিমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'আচ্ছা মা, তুমি কি করে জানলে যে আমি সিনেমা দেখেছি?'

আমি হেসে উত্তর দিলাম– 'আমার মন বলেছে।'

কবি তখন ছেলের কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে বললেন, 'তোর মাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তোর কেন, তোর বাবারও নেই।'

মঞ্জুশ্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত তমলুকে তার পিসিমা শ্রীমতী সুচরিতা দাশের কাছেই ছিল। আমাদের কাছে এসে আই এ-তে ভর্তি হল। কবির কবিত্ব-শক্তির কিছুটা অংশ নিয়েই সে জন্মেছে, আট বছর বয়েস থেকেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে। প্রথম প্রথম ভাল না হলেও সে হতাশ হয়নি। দশ বছর বয়েসে ভালই লিখতে শিখল। মঞ্জুর সেই সময়কার একটি কবিতা তার পিসেমশাই শ্রী চিদানন্দ দাশগুপ্ত কোন একটি পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। মেয়ে যত না পড়াশুনা করেছে–কবিতা লিখেছে তার চাইতে অনেক বেশী। এ বিষয়ে সে তার বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেত।

বহুবার কবিকে বলতে শুনেছি–'লেখ, তুই লেখ। তোর মাকে দিয়ে ত' আর এসব কাজ হবে না। তুই-ই আমার নাম রাখবি।'

মেয়েও হাসত আর বলত, 'আচ্ছা বাবা, মা কেন কবিতা লেখেন না?'

'কাব্যলক্ষ্মী তোর মাকে ভীষণ ভয় পান যে, তাই তো তিনি তোর মায়ের ধারে, কাছেও ঘেঁষেন না।' হেসে কবি উত্তর দিতেন।

মঞ্জু তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করত– 'সত্যি নাকি মা?'

'সেটা আমার চাইতে তোর বাবাই ভাল জানেন।' আমি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিতাম।

কবি এবং তাঁর মেয়ের এই মনোভাবের ছোট্ট একটি ঘটনা বলছি।

এক ছুটির দুপুরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মেঘের শব্দে জেগে দেখি ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে– আর বাইরে যত কাপড় মেলা ছিল সব ভিজছে। বাবা ও মেয়ের দৃষ্টিপাতও নেই। তারা দুজনে কবিতার আলোচনায় গভীরভাবেই মগ্ন।

আমি মেয়েকে বললাম– 'কাপড়গুলো সব ভিজে গেল, তুই একটু কষ্ট করে তুলতেও পারিস নি!'

'ওমা, কাপড়গুলো বাইরে ছিল বুঝি?' মেয়ে হাসি মুখেই উত্তর দিল।

কিন্তু কবি বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'তোমার কেবল সংসার আর সংসার। তুমি কি কিছুতেই তার উপরে উঠতে পার না? কোনদিনও দেখলাম না যে তুমি কবিতার আলোচনায়, মুহূর্তের জন্যও যোগ দিয়েছ।'

আমি কাপড় তুলতে তুলতেই বললাম, 'আমি কাব্য-জগতের ধার ধারি না। কবিতার চাইতে সংসারকেই বেশী ভালোবাসি।'

কবিবন্ধু বুদ্ধদেববাবু একদিন কবিকে বলেছিলেন–'আপনার ঘরখানি দেখলে কবিতা আপনা থেকেই আসতে চাইবে। কিন্তু এ কৃতিত্ব কার? নিশ্চয়ই আপনার না।'

তাঁর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে কবি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

মঞ্জুকে আমি প্রায়ই বলতাম, 'বড় হয়েছিস, কিন্তু রান্নাবান্না তো কিছুই শিখলি না।'

আমার কথায় মেয়ে সত্যি সত্যিই একদিন রান্নাঘরে এল। রান্নার কোন কিছু ধরেওনি–এমন সময় কবি কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলতে শুরু করলেন, 'পুড়ে মরবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি? শিগ্‌গির বেরো। তোর মায়ের যেমন কাণ্ড, তোকে শেষ না করে ছাড়বে না।'

মঞ্জু রান্নাঘর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কবি সেখান থেকে এক পাও নড়লেন না।

তিনি নিজে ত' স্টাইলের ধার দিয়েও যেতেন না, কিন্তু মেয়ের বেলায় কতখানি যে চিন্তা করতেন তার প্রমাণ পেয়েছি ছোট্ট একটি ঘটনায়।

মঞ্জু তখন আই এ পড়ে। কবির অমত থাকা সত্ত্বেও আমি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছিলাম। অবিশ্যি মেয়েকে না জানিয়েই। একবার একটি ছেলে মঞ্জুকে দেখতে এল। ছেলেটি ভাল ঘরের এবং বেশ ভাল চাকরি করে। তবে অতি সাদাসিধে। কবিকে যখন ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, দেখলাম ছেলের চাইতে তার বেশভূষা–বিশেষ করে কোঁচার দিকেই তাঁর ব্যগ্র দৃষ্টি। আমি ব্যাপারটা তখুনি আঁচ করে নিলাম।

কবির তো এই ভাব–ওদিকে মেয়ের কাণ্ড দেখে তো আমি হতভম্ব। সে তো আর জানে না যে তাকে দেখতে এসেছে। যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখছে এমন ভাবেই দেখতে লাগল ছেলেটিকে।

ছেলেটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি একে যোগাড় করলে কোথা থেকে?'

'কেন, ওর দোষটা কি হল?'

'না, দোষের কিছু হয়নি। তবে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে একে ধুতি পরানো শেখাতে শেখাতেই মেয়ের জীবন কেটে যাবে।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, –'কি বলিস রে?'

মেয়েও ত' তেমনি–তখুনি উত্তর দিল–'ও বাবা, এই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে নাকি? যেভাবে উঁচু করে কোঁচা ঝুলিয়েছে–আমি বাঙালী বলে বুঝতেই পারিনি–'

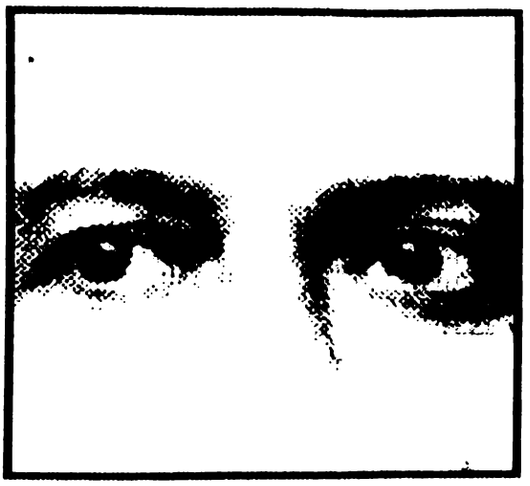
'ঠিকই বলেছিস। একটু সাবধানে থাকিস। এরপরে তোর মা আবার কি এনে হাজির করবেন কে জানে?'

আমি তখন বেশ রাগের সঙ্গে বলতাম– 'খুব হয়েছে। আর বলতে হবে না। কিন্তু মেয়ের বাবা যখন রোহিনী গুপ্তের মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কোঁচাটা কত লম্বা ছিল শুনি?'

কবি তাঁর ঘরে যেতে যেতে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে বলতে গেলেন

"সে যুগ হয়েছে বাসী,
সে যুগেতে আর এ যুগেতে এবে
তফাৎ অনেক বেশি।"

হায়রে! অসময়ে এবং অতর্কিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর এত আদরের মঞ্জু ও সমরকে দেখতে পাবেন না–তাদের কোলে টেনে নিয়ে বুকভরা শান্তি আর মনভরা তৃপ্তি কোনদিনই অনুভব করতে পাবেন না–একথা ভেবে না জানি কত দুঃখ, কত ব্যথা নিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে–তার নীরব সাক্ষী রইলেন শুধু অন্তর্যামী ভগবান।



শিশুকাল থেকেই কবির অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর মায়ের সঙ্গেই সব চাইতে বেশী। কাজেই আদর আবদার যা কিছু সবই ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের বউ হিসেবে তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটত রান্নাঘরের নানা কাজে। তাই কবিকে বেশ খানিকটা সময় তাঁর ঠাকুমার কাছেই থাকতে হ'ত। সেই সময় তিনি কবিকে অনেক গল্প শোনাতেন। ঠাকুমার কাছেই তিনি শুনেছেন কীর্তিনাশার কীর্তিকথা। শুনেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষের বহু কাহিনী।

বরিশালে বগুড়া রোডে ৫/৬ বিঘা জমির উপরে কবির ঠাকুরদাদা বাড়ি করেছিলেন। সেই জমির কোথায় আনারসের রং হলুদ হয়েছে, গাছে ক'টা আম ক'টা কাঁঠাল পেকেছে, কোন্ গাছটার জাম বেশী সুস্বাদু সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে।

গ্রীষ্মের দুপুরে ঠাকুমা যখন তাঁর অতিপ্রিয় আচারের শিশি, বোতল অথবা আমসত্ব রোদে দিয়ে কবিকে পাহারা দিতে ডাকতেন, তিনি সানন্দে রাজী হয়ে যেতেন। ফলে আচার এবং আমসত্বের পরিমাণ রোজই কিছুটা কমে যেত। এ কাজ অবিশ্যি তিনি নির্বিকার চিত্তেই ক'রে যেতেন।

ঠাকুমার একজন ভাই ছিলেন। তিনি, কবি ও কবির ছোট ভাই অশোকানন্দ একই ঘরে শুতেন। কবির মুখেই গল্প শুনেছি–শীতের রাতে সেই ভদ্রলোকের লেপের কোণে মোটা সুতো অথবা সরু দড়ি বেঁধে তার মুখটা দু ভাই নিজেদের হাতের ভিতরে রেখে দিতেন। তিনি যখন আরাম ক'রে লেপখানা গায়ে জড়িয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করতেন, তখনই দেখা যেত সেখানা তাঁর গা থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আরামে ঘুমানো আর তাঁর হ'ত না। কিন্তু কিছু বোঝারও উপায় ছিল না। কারণ দু ভাই তো লেপমুড়ি দিয়েই ঘুমুচ্ছে।

সকালে এই ঘটনা শুনে কবির মা কিন্তু ঠিক্‌ই ধরে ফেলতেন–এ কাজ কাদের। এ জন্যে কিছু স্নেহমাখা শাসনও ভোগ করতেন অপরাধীরা।

বাবার সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিল অতি সম্ভ্রমের। তাঁর মনের মণিকোঠাটি ভরা ছিল বাবার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায়। সে শ্রদ্ধা পরিমাপের ক্ষমতা বাইরের জগতের ছিল বলে আমার মনে হয় না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাঁর সামনে যেতে অথবা নিজে থেকে কথা বলতে তাঁকে আমি কোনদিনই দেখিনি। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে।

বরিশালে আমাদের কাপড় কেনার জন্য একটি দোকান ঠিক করা ছিল। আমার শ্বশুরমশাই চিঠি লিখে দিলেই সেই দোকান থেকে কাপড় আনা হ'ত।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রথম থেকেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে সংসারের প্রত্যেকটি লোকের জন্য আমার শাশুড়ী হাসিমুখে এবং অক্লান্ত ভাবেই তাঁর কর্তব্য করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর কি দরকার বা কোনটা নেই সে কথা ভাববার দায়িত্ব কেউই নিতেন না। অথচ ছোটবড় সকলেই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনি ভালবাসতেন।

বরিশালের বাড়িতে প্রত্যেকেরই জন্মদিন পালন করা হত। শাশুড়ীর জন্মদিনে আমি দেখলাম, তিনি অতি আনন্দের সঙ্গে সকলকে খেতে দিচ্ছেন, সকলের সঙ্গে হাসি গল্প করছেন, কিন্তু পরে আছেন একখানি আধময়লা শাড়ি। লোকে কি মনে করবে এই লজ্জায় তিনি ধবধবে ফরসা শাড়ি কিছুতেই পরতে চাইতেন না।

আমার কিন্তু খুবই খারাপ লাগল। আমি একবার কবিকে বললাম, 'তোমরা দুই উপযুক্ত ছেলে থাকতে আজকের দিনে মায়ের একখানা ভাল শাড়ি জুটল না?'

কবি অম্লানবদনে উত্তরে দিলেন, 'কাপড় কেনার ভার বাবার হাতে। আমি ওসবের মধ্যে নেই। মায়ের শাড়ির দরকার থাকলে তিনি নিজেই বাবাকে বলবেন।'

একেবারে নতুন বউ বলেই কবির এ মন্তব্য শুনেও আমাকে চুপ করেই থাকতে হ'ল।

তার পরের বারে এই দিনটিতে সকাল-বেলাই কবিকে বললাম, 'আমি কাপড় কিনব। তুমি বাবাকে বল দোকানে একখানা চিঠি দিতে।'

আমার কথা শুনে তিনি রীতিমত আঁতকে উঠলেন 'ওরে বাবা! তোমার আবদার তো কম নয়। তোমার কাপড়ের শখ মেটাবার জন্য

আমি বাবাকে বলতে যাব? পৃথিবী উল্টে গেলেও এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুমি মাকে গিয়ে বল।'

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আমি নিজেই যদি বলি, তিনি কি রাগ করবেন?'

কবি তখন আমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য উত্তর দিলেন, 'তা একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি নতুন এসেছ। সেটা কি ভাল দেখাবে?'

আমি 'দেখা যাক' বলে সেখান থেকে উঠে সোজা আমার শ্বশুরমশাই-এর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি তখন বিছানায় শুয়ে একখানা বই পড়ছিলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললাম, 'বাবা আমি কাপড় কিনব। দোকানে একখানা চিঠি লিখে দিন।'

দেবতা কাকে বলে জানি না। কিন্তু তাঁকে বোধ হয় আমি দেবতার চাইতেও বড় বলে মনে করতাম। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অতি প্রখর। আমার কথা শুনে আস্তে আস্তে বইখানি বন্ধ করে রেখে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বেশ তো, বল, ক'খানা আনতে হবে? তুমি যে ক'খানা বলবে আমি তা-ই লিখে দেব।'

মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে আমি অনেকগুলো শাড়ির ফরমাস দিয়ে ফেললাম। কেন যে শাড়ি কিনতে চাইছি সেটা কবি না বুঝলেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন।

শ্বশুরমশাই-এর চিঠি পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই দোকানের একজন কর্মচারী দশ বারোখানা ভাল শাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কাপড় দেখে কবির তো চোখ কপালে উঠবার যোগাড়। 'সর্বনাশ! এ তুমি কি করলে? সত্যি সত্যিই বাবার কাছে কাপড়ের কথা বলতে পারলে? তোমার তো অনেক শাড়ি আছে, আবার না কিনলেই চলছিল না? না, তুমি আমাকে বরিশালে আর থাকতেই দেবে না দেখছি।'

আমি তখন শাড়ি বাছতে ভীষণ ব্যস্ত। মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম, 'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

আমার কথা শুনে কবি খুব বিরক্ত হয়েই সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি সাদা একখানা ভাল ঢাকাই শাড়ি বেছে নিয়ে বাকি সব কাপড় ফেরৎ দিলাম।

বিকেলে শাশুড়ী সকলকে খেতে দিতে যাবার আগে আমি তাঁর কাপড়ের আঁচল ধরে টেনে রেখে বললাম, 'আপনি এ বেশে যেতে

পারবেন না। একটু বসুন।' বলেই আমি তাঁর হাতে একখানি চিরুণী দিয়ে বললাম, 'নিন, আগে চুলটা আঁচড়ে ফেলুন তো।' চুল আঁচড়ান হয়ে গেল আমি সেই শাড়িখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

তিনি তো হতভম্ব। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'এসব তোমার কি পাগলামি? আমার কি সাজবার বয়েস আছে? তাছাড়া এ শাড়ি পরে আমি লোকের সামনে বের হব কি করে?

'তা কি করবেন? না হয় বেশি করে ঘোমটা দিয়েই যাবেন। কিন্তু এ খানা না পরলে আমি আজ আপনাকে কোন কাজই করতে দেব না।'—হাসিমুখেই আমি উত্তর দিলাম।

তিনি আমাকে খুব ভালই চিনতেন। তাই আর ঘাঁটাতে সাহস না করে শাড়িখানা শেষ পর্যন্ত বাধ্য মেয়ের মত পরেই ফেললেন। তারপর আমি প্রথমেই কবিকে ডাকলাম। তিনি এসে তাঁর মায়ের দিকে তাকিয়েই বলে ফেললেন, 'বাঃ! কুসুমকুমারীকে তো বেশ দেখাচ্ছে।'

মা চলে যেতেই তিনি আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন আশীর্বাদই করলেন 'বাবাকে বলে কোন কাজ করাবার সাহস আমার কোনদিন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু তুমি পারবে। সব অবস্থায় এগিয়ে যাবার মত সাহস এবং শক্তি তোমার আছে। এই শক্তিই তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবে।'

কিন্তু মায়ের বেলা ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। অথচ তিনি ছিলেন মা অন্ত প্রাণ। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে মায়ের স্নেহকোমল স্পর্শ না পেলে কোন কিছুই তাঁর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত না।

আমার শাশুড়ী চিরদিন পরের দরকারটাই বড় করে দেখেছেন। নিজের কথা ভাববার সময় তাঁর কখনই হত না। কতদিন দেখেছি—তাঁর প্রায় নতুন শাড়িখানা নিঃস্ব কোন পরিবারের বউ অথবা মেয়েকে দিয়ে দিচ্ছেন। যদি কখনও বলেছি—'মা, আপনার শাড়িখানা দিয়ে দিলেন?' তিনি হাসিমুখে উত্তর দিতেন, 'এই মেয়েটিকে সাহায্য চাইতে অনেক জায়গায় যেতে হবে। কাজেই একখানা আস্ত কাপড়ের যে এর একান্ত দরকার। তা ছাড়া আমাকে দেবার জন্য তো তোমরাই আছ। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেবার যে কেউ-ই নেই মা।'

তাঁকে যদি হাত-খরচের জন্য দশটা টাকাও দেওয়া হত, তার আট টাকাই তিনি পরের জন্য খরচ করে ফেলতেন। তাঁর যে থাকল না, এ নিয়ে কোনদিন সামান্য একটু দুঃখ প্রকাশ করতেও আমি শুনিনি।

এসব ব্যাপারে কবি তাঁর মাকে ভালই চিনতেন। মা যখন ল্যান্সডাউন রোডে আমাদের বাড়িতে ছিলেন, তখনকার সময়ের একটা ঘটনা বলছি।

গ্রীষ্মের এক দুপুরে আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। নিদ্রা-দেবীর, বহু আরাধনা করে সবে ঘুমটা একটু এসেছে, এমন সময় কানে গেল, 'মিলু (কবির ডাক নাম) আমাকে একটা খাম দিবি?' কথাটা বার দুই শুনলাম। বুঝলাম, মা কবির কাছে খাম চাইছেন। কিন্তু যাঁকে বলা, তাঁর কানে আদৌ ঢুকেছে বলে মনে হল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কবির গলা শোনা গেল 'আমাকে অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে। আমি পয়সা দিচ্ছি। তোমার যে কটা দরকার কাউকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আর কাল হলে যদি চলে, তবে আমি নিজেই এনে দিতে পারি।'

কবির কথা শুনে মা চুপ করেই রইলেন। কিন্তু আমার আর সহ্য হল না। আমি কোনও কথা না বলে সোজা কবির ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিল থেকে তিনটে খাম তুলে নিলাম। কবি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'কর কি? কর কি? সব কটা খামই আমার লাগবে।'

আমি খাম নিয়ে চলে আসতে আসতে বললাম, 'পোস্ট-অফিস সামনেই। সোজা গিয়ে নিয়ে এস।'

কিন্তু মজা হল এই–মা খাম তো নিলেনই না, উল্টে আমাকে বললেন, 'তুমি আবার ওর দরকারী খাম আনতে গেলে কেন? আমি তো আর নিজের জন্য চাইছি না। যাকে দেব, তাকে কাল দিলেও চলবে।'

আমি তখন রাগ করে খাম তিনটে কবির টেবিলেই ফেলে দিয়ে এলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন, 'এতদিনেও তুমি মাকে চিনলে না? আমি তো শোনা মাত্রই বুঝেছি যে, তিনি নিজের জন্য চাইছেন না।'

কবি অবিশ্যি তবে পরদিনই মাকে খাম এনে দিলেন।

এইরকম বাবা মায়ের সন্তান হয়ে পৃথিবীতে আসতে পারায় কবি চিরদিন নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করেছেন। ঝড়, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের ঘনঘটা কালো আবরণে বহুবার তাঁর জীবনকে ঢেকে ফেলেছে–ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পথ হারিয়ে দিশেহারা তাঁকে হতে হয়েছে বৈকি। কিন্তু তাঁর মা বাবার আশীর্বাদই আলো হয়ে তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে সোজা হয়ে হেঁটে যাবার শক্তি যুগিয়েছে।

কবির কথা বলতে গিয়ে আজ মনে পড়ে কবির পরলোকগতা জেঠিমার কথা। মনে পড়ে তাঁর ছোট পিসিমার কথা। কাকা ব্রহ্মানন্দ দাশের সঙ্গে কবির সম্পর্কের কথা।

আমাদের জেঠিমা অতি অল্প বয়সে সর্বানন্দ পরিবারের বউ হয়ে এসেছিলেন। সেকালের মেয়ে তিনি। বিয়ের আগে লেখাপড়ার কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। কিন্তু পরে নিজের চেষ্টায় বাংলা ছেড়ে ইংরেজীও তিনি ভালই শিখেছিলেন। কারণ আমি বরিশালে গিয়ে তাঁকে বহু ইংরেজী গল্পের বই পড়তে দেখেছি।

এই জেঠিমা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার পরে কবি আমাকে বলেছেন, 'স্বামী এবং ছোট মেয়েটিকে (তিনটি মেয়ের মধ্যে) হারাবার পর তিনি যেন দ্বিধাহীনভাবেই নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। যেখানে অসুস্থ অসহায় মানুষ–সেখানেই আমাদের মমতাময়ী জেঠিমা। রাত দুপুরেও যদি তিনি শুনতে পেতেন যে, পাড়ার কেউ খুবই বিপদে পড়েছে, অথবা অসুস্থ হয়ে কষ্ট পাচ্ছে; তাকে দেখবার কেউ-ই নেই, তিনি তখুনি ছুটে চলে গিয়েছেন তার কাছে। জাতের সংস্কার কোনদিনই তাঁকে এইসব অসহায় দুর্বল মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। এই সেবাপরায়ণা মহিমাময়ী নারীর সান্নিধ্যে যিনিই এসেছেন, তিনিই নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছেন–সান্ত্বনা পেয়েছেন মৃত্যুপথযাত্রী।

মাতৃসমা জেঠিমা সম্বন্ধে কথাগুলি বলবার সময় কবির মনের দরদ এবং গভীর শ্রদ্ধা যেন প্রতিটি অক্ষরের ভিতর দিয়েই ঝরে পড়ছিল।

কবির কাকা ব্রহ্মানন্দ দাশের কোন ছেলে না থাকায় তিনি তাঁর দাদার এই প্রথম সন্তানটিকে মনে মনে হয়ত গভীরভাবেই স্নেহ করতেন। তাই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবির অন্তিম শয্যাপাশে দেখেছি তাঁর অস্থির মনের ব্যাকুলতা। মুখে তিনি কিছুই প্রকাশ করেননি। শুধু দুটি হাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করে অনবরত পায়চারি করেছেন। কি এক অব্যক্ত বেদনাভরে মাথা তাঁর নুয়ে নুয়ে পড়েছে। আমি নির্বাক হয়ে সবই লক্ষ্য করেছি। তাঁর তখনকার অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছে–তিনি শুধু যে কবির কথাই ভাবছেন, তা নয়, তাঁর দাদা এবং মেজো বৌঠানের (কবির বাবা, মা) কথা হয়তো স্মরণে আসছে তাঁর। কবির অবর্তমানে আমাদের কি হবে–এ কথাও হয়তো তিনি ভাবছেন।

এই কাকা সম্বন্ধে কবিকে বহুবার বলতে শুনেছি, 'আমাদের কাকাকে সহজে বোঝা যাবে না। মুখে তাঁর রুক্ষ ভাষা, কিন্তু অন্তরে তাঁর ফল্গুর ধারা। তাঁর কর্তব্যবোধ অসীম–পরিবারে তাঁর দানেরও সীমা নেই। কিন্তু সবই নীরবে। কোন প্রকার অভিব্যক্তিই তাঁর নেই।'

কবির ছোট পিসিমা চিরকুমারী স্বর্গীয়া স্নেহলতা দাশ যতদিন বেঁচে ছিলেন, পরিবারের সকলকে অন্তর দিয়েই আঁকড়ে ধরেছিলেন। মায়ের পরে এই ছোট পিসিমার সঙ্গে কবিকে মন খুলে কথা বলতে এমন কি হাসি ঠাট্টা করতেও দেখেছি। আবার মাকে হারিয়ে এই পিসিমার মধ্যেই মায়ের অস্তিত্বকে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতেও দেখেছি।

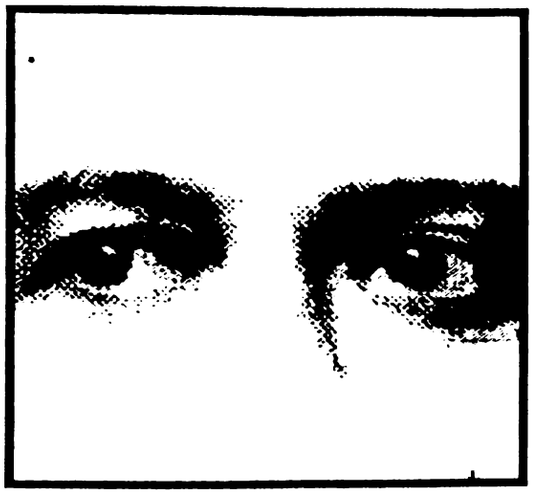
ছোট পিসিমা আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে পণ্ডিতিয়া প্লেসে কাকার (শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশ) বাড়িতে যাবার সময় যে মুহূর্তে বলেছেন, 'মিলু এবারে যাই', অমনি কবি তাঁর কবিতার খাতাপত্র ফেলে রেখে পিসিমার ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'এখনি কি যাবে? আর দু-একটা দিন থেকে যাও না। ভাইয়ের বাড়ি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? থাক, থাক। আরো যে কদিন পার, থাক না।' তারপর ছেলেকে ডেকে বলতেন, 'খোকন, দেখ তোর তিপীমা (আমার ছেলে ও মেয়ে পিসীমাকে এই নামেই ডাকত) চলে যাচ্ছেন।'

খোকন তখন দৌড়ে এসে পিসীমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলত, 'ইস্। গেলেই হল? ঠাকুরমার বদলে এখন তোমাকেই আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে।'

ছোট পিসীমা বহুদিন রোগশয্যায় পড়েছিলেন। শেষের দিকে একটু খেয়ালীও হয়েছিলেন। কারো কথাই শুনতে চাইতেন না। কিন্তু আমি যখনি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'পিসীমা, আমাকে চিনতে পারেন?' তিনি এক গাল হেসে উত্তর দিয়েছেন, 'ওমা, তুমি মিলুর বউ, তোমাকে চিনতে পারব না?' তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, 'কাঁচা ছেলে মিলু চলে গেল। আর আমি পড়ে রইলাম', বলতেন, আর দু চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ত। পিসীমার মুখের এ কথা থেকেই বোঝা যায় যে কবির স্মৃতি তাঁর অবচেতন মনের অনেকখানিই অধিকার করে ছিল।

কবি ছিলেন তাঁর বড় মামা প্রিয়নাথ দাশগুপ্তের অতি প্রিয়। তিনিই তাঁকে দীঘির জলে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছিলেন–শিখিয়েছিলেন নানা গল্পের ভিতর দিয়ে আকাশের তারার সঙ্গে পরিচিত হতে।

বড় মামা যখন নৌকা করে কোথাও যেতেন, কবিকেও সঙ্গে নিতেন। তাই ছোটবেলা থেকেই বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতি, নদী, খাল এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয়ের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। কবির কবিত্বে অভিষেক হয়তো সেই তখন থেকেই।



আপাতদৃষ্টিতে কবি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু সেই গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকত তাঁর কৌতুক-প্রিয়তা। উপরে গাম্ভীর্যের একটা আবরণ থাকাতে তাঁর ঠাট্টা-তামাশা লোকে চট্ করে ধরতে পারত না।

আমি যখন বরিশালে ছিলাম, তখন সেখানকার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টধর্ম বহুল পরিমাণেই প্রচারিত ছিল। বগুড়া রোডে, আমাদের বাড়ির কাছেই বেশ খানিকটা জমি নিয়ে অক্সফোর্ড মিশন নামে ক্রীশ্চানদের একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। প্রতি রবিবার ওখানকার গির্জায় বিশেষ ভাবে উপাসনা হত এবং সকলকে ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করতে হত।

আমাদের বাড়িতে একজন ক্রীশ্চান বুড়ো-ঝি ছিল। বয়েস বেশী হয়ে যাওয়াতে কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারত না। কিন্তু অনেকদিন ধরে আছে বলে আমার শ্বশুরমশাই তাকে একখানি ছোট ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সে সেখানেই থাকত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা–বিশেষ করে কবি ছিলেন তার বড় আপন–বড় স্নেহের। সেজন্য আমার বিয়ের পরে অন্যান্যদের সঙ্গে সেও আমাকে টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল। তার বেশীর ভাগ দাঁতই পড়ে গিয়েছিল। আর–কুঁজো হয়ে হয়ে ছাড়া সোজাভাবে হাঁটতেই পারত না।

প্রতি রবিবারে ওই বুড়ো ঝি-ও যেত ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করতে। বুড়ো হওয়াতে মাথাটাও তার সব সময় ঠিক থাকত না। তার একটা ধারণা হয়েছিল যে হ্যাভোক নামে একজন ফাদার তাকে ভালবাসেন। এমন কি বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও (ফাদার হ্যাভোক বুড়ো ঝি-এর চাইতে বয়েসে অনেক ছোট ছিলেন) তাকে বিয়ে করে সংসারী হতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

এ ধারণা হবার একমাত্র কারণ এই যে মিশনের সব ফাদার ভাল বাংলা বলতে পারতেন না। ফাদার হ্যাভোকও তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা যেমন বলি, 'ভগবান সকলকে ভালবাসতে বলেছেন। তাই আমরা তোমাদের ভালবাসি।' ফাদার হ্যাভোকও তেমনি বলতেন, 'প্রভু যীশু বল্‌সেন (বলেছেন) সকোলকে প্রেম ক'রটে (করতে)। টাই (তাই) হামিও (আমিও) টোমাকে (তোমাকে) প্রেম করি। সুণ্ডরমালা (সুন্দরমালা–বুড়ো ঝি-এর নাম) সটি-ই (সত্যিই) হামি টোমাকে প্রেম করি।'

এসব কথা সকলের কাছে গল্প করাতে পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলেই তাকে বুঝিয়েছিল যে ফাদার হ্যাভোক তাকে সত্যিই ভালবাসেন এবং সে যদি রাজী হয়, তিনি তাকে বিয়েও করতে পারেন। তবে বিয়ের আগে তাকে দাঁত বাঁধিয়ে নিতে হবে। ফোকলা দাঁতে তো আর বিয়ে হতে পারে না। সকলের ঠাট্টার ফলে এ ব্যাপারে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল।

পাপ স্বীকার করে ফেরার সময় সে সকলকে গালাগালি দিতে দিতেই ফিরত। তার সে-সব ভাষা আমরা ঘরে বসেও শুনতে পেতাম। বুড়ো ঝি-এর গলা শুনলেই কবি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন আর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? পাপ স্বীকার করতে বুঝি?'

কবিকে দেখেই সে একগাল হেসে উত্তর দিত, 'হয় (হ্যাঁ)।' তিনি তখন মুখের উপরে বেশ একটু চিন্তার রেখা টেনে প্রশ্ন করতেন, 'শুনলাম, ফাদার হ্যাভোক তোমার জন্য দাঁত বাঁধাতে দিয়েছেন। তোমাকে তিনি কিছু বলেছেন কি?'

ঘর থেকে আমার শাশুড়ী চাপা গলায় বলতেন, 'মিলু, থাম্। বুড়ো মানুষটার সঙ্গে আবার লাগতে গেলি কেন?'

যেদিন তার মন ভাল থাকত, কবির কথা শুনে হাসত। কিন্তু যেদিন রেগে থাকত, সেদিন বলত,–'হ্যাবোগ্যারে (হ্যাভোককে) মরণ দহায় (দশায়) পাইছে। দেহা (দেখা) করনের লেইগ্যা (জন্য) যত চ্যাষ্টাই করি না ক্যান, হেডায় (সে) কি দেহা দেয়? না হামনে (সামনে) আহে (আসে)? ক্যাবল আড়ালে আবডালেই রয়। রও, হেডারে (তাকে) একবার পাইয়া লই। হ্যার (তার) মতিগতি (মনোভাব) ভাল কইরাই (ভাবেই) বুইঝ্যা লইমু। বিয়া করনের ফিকির দেহায়–কাজের কালে ঢনঢন। বড় ফাদাররে কইয়া দেহাইমু (দেখাব) না মজাডা?'

আমার দাদাশ্বশুর (শাশুড়ীর বাবা) গৈলার চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একজন রসিকপুরুষ ছিলেন। তিনি অনেক হাসির গান লিখে গিয়েছেন। তিনি যখনই আমাদের বাড়িতে আসতেন, স্নান করার পরে আমরা তাঁকে শাড়ি

পরতে দিতাম। তিনিও খুশী হয়েই শাড়ি লুঙ্গির মত পরে অনেক হাসির কবিতা আওড়াতেন।

দাদামশাইকে স্নান করে আসতে দেখলেই কবি সহাস্যে এগিয়ে এসে বলতেন, 'কি হে চন্দরনাথ, শাড়ির পাইড় পছন্দ হইছে? চুল আঁচড়ানের কাকই (চিরুণী) পাইছ? তোমারে আর কি দ্যাওন যায়–কও।'

আমার শাশুড়ী হাসি সামলাবার জন্য তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতেন। কবির কথার উত্তরে দাদামশাই এক হাতে আমাকে আর এক হাতে কবিকে জড়িয়ে ধরে গান ধরতেন–

'বাজার হুদ্যা কিন্যা আইন্যা চাইলা
দিছি পায়,
তোমার লগে ক্যামতে পারুম হইয়া
উঠছে দায়।
আরশি দিছি, কাকই দিছি, চুল
বাঁধনের ফিতা দিছি,
ব্যালয়ারী চুড়ি দিছি, আর কি
দ্যাওন যায়?
বুড়া-বুড়া কইয়া ক্যাবল, ক্ষ্যাপাইয়া
ক্যান কর পাগল?
যহন বিয়া করছ ফ্যালবা কেমতে কইয়া
দ্যাও আমায়।'

আমার শাশুড়ী ছিলেন বরিশাল মহিলা সমিতির সম্পাদিকা। সেজন্য নানা কাজে অনেকেই তাঁর কাছে আসতেন। কবিকে আমি কোনদিনই তাঁদের সামনে বের হতে দেখিনি। কিন্তু কোন কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না।

একদিন যেমনি কালো তেমনি মোটা এবং বেঁটে এক মহিলা আমার শাশুড়ীর কাছে এলেন। তিনি চলে যাবার পরেই কি একটা দরকারে আমার শাশুড়ী কবিকে ডাকলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরসুন্দরী চলে গিয়েছেন?'

মা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'তুই কার কথা বলছিস?' কবি চটপট উত্তর দিলেন, 'কেন, এই যে কিছুক্ষণ আগে তোমার কাছে আসতে দেখলাম?'

মা তখন রাগতে গিয়েও হেসে ফেললেন।

আমি ছিলাম আমার শাশুড়ীর অতি আদরের। তিনি যে আমার নিজের মা নন, একথা আমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি। তাই তিনি আমাকে রাগ করে কিছু বললে আমিও পাল্টা জবাব দিতাম। রাতে কথা কাটাকাটি হলেও পরদিন ভোরে দেখা যেত যে আমি উঠবার আগেই আমার জন্য চা ও খাবার হাতে তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম দু-একদিন কবি বিরক্ত হয়ে আমাকে থামাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন দেখলেন যে রাতে যত বেশী রাগারাগি, দিনে তত বেশী আদর, তখন তিনি আমাকে আর কিছুই বলতেন না। আমি রাগলেই শুধু একবার উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েই স্বগতোক্তি করতেন, 'আমার নিজের মা, কিন্তু আমার সঙ্গে কেন যে এই রকম রাগারাগি হয় না? ভাল মন্দ কিছু খাবার কপাল তো আর করে আসিনি। কি আর করব।' তারপরেই আবার উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা, কাল তোমার জন্য নতুন কি খাবার হবে–কিছু অনুমান করতে পার কি?'

আমি 'ওমা, দেখুন তো' বলে ঝাঁঝিয়ে ওঠার সঙ্গেই তাঁকে আর ধারে কাছে কোথাও দেখতে পাওয়া যেত না। কারণ, শাশুড়ী নিজে আমার উপর রাগ করলেও যদি কখনও শুনতেন যে কবি আমাকে কিছু বলছেন, তাহলে ছেলেকে কিছুতেই ছেড়ে কথা কইতেন না।

আদর শুধু যে শাশুড়ীর কাছেই পেয়েছি তা নয়, অনেক ব্যাপারে কবি নিজেও আমাকে যথেষ্টই প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমি যে ছেলেবেলাতেই মা বাবা দুজনের স্নেহ হারিয়েছি সে-কথা তিনি নিমেষের জন্যও ভুলতেন না।

আমার বিয়ের দশ বারোদিন পরে ঢাকায় আমার জেঠামশাই-এর কাছে যাওয়া ঠিক হল। আমি মনের আনন্দে বাক্স গুছোতে বসলাম। অল্প ক'দিনের জন্য যাচ্ছি বলে শাশুড়ী একটা ছোট বাক্সে সামান্য কিছু জামা কাপড় নিতে বললেন। কিন্তু নেবার সময় আমি কোনটাই বাদ দিতে পারছিলাম না। অথচ বাক্সেও আঁটে না। দুবার, তিনবার চেষ্টা করার পরেও যখন কিছুতেই পারা গেল না, তখন রাগ করে বাক্সটাকে উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে গেলাম।

কবি কাছে বসে সবই দেখছিলেন। আস্তে আস্তে আমার কাছে গিয়ে বসলেন, 'তুমি তো গোড়াতেই একটা ভুল করে বসে আছ। অল্পদিন থাকলে ঐ ছোট বাক্সে কুলিয়ে যেত। তুমি না হয় বেশীদিনই থাকলে। থাকার ইচ্ছেটা তো তোমার। সেটা অন্যের কথায় কি করে হবে?' তখন

আমার মুখে হাসি ফুটল। আমি বড় একটা বাক্স নিয়ে কাপড় গুছোতে বসলাম।

কিন্তু কোথায় গেল সে সব দিন? পর্দার বুকে ছায়াছবির মতই একের পর এক মিলিয়ে গেল। যা কিছু দেবার ভগবান আমাকে তো দরাজ হাতেই দিয়েছিলেন। কিন্তু সব হারিয়ে আজ আমি রিক্ত, শূন্য হয়েই বসে আছি।

লোকে জানে, কবি ছিলেন শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে ভালোমানুষ। তাঁকে চালানো খুবই সোজা। কিন্তু ছাইচাপা আগুনের মত সেই নিরীহ ভাবের নীচেই চাপা থাকত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তবে অকারণ চিৎকারে সে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করাটা তিনি কোনদিনই পছন্দ করতেন না। শান্তভাবে, অল্প কথার ভিতরেই ছিল তাঁর অভিব্যক্তি। তাঁর এ পরিচয় আমি বহুবার বহুভাবে পেয়েছি।

তিনি মিলের মোটা ধুতি ছাড়া পরতেন না, এবং একটু উঁচু করেই পরতেন। আমি একদিন একখানা ভাল ধুতি কিনে কবিকে বললাম,—'কী যে তুমি মোটা মোটা ধুতি হাঁটুর উপরে পরে রাস্তা দিয়ে হাঁট। লোকে হাসে না?' কথাটা বলেই ধুতিখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

তিনি তখন কি একটা লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ধুতিখানা ধরেও দেখলেন না। তাঁর মুখে সামান্য একটু বিরক্তির ভাবও প্রকাশ পেল না। শুধু লেখাটা থামিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখ, তুমি যে ভাবে খুশি সাজ-পোশাক কর, তোমার সে ইচ্ছেয় আমি কোনদিনই বাধা দেব না। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছামত চালাতে বৃথা চেষ্টা কোরো না!'

তিনি রাগলেনও না, বকাবকিও করলেন না। কিন্তু আমার মনে হল কে যেন আমার শরীরের সমস্ত শক্তি টেনে নিয়েছে। আমি কোনও মতে নিজেকে টানতে টানতে সেখান থেকে সরে এলাম।

যতদিন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, আমার মুখ থেকে এ রকম কথা আর কোনদিনই বের হয়নি। যেদিন তিনি চিরদিনের মতই যাত্রা করলেন, সেই ধুতিখানাই পরিয়ে দিলাম। সেখানা বছরের পর বছর আমার বাক্সেই রাখা ছিল।

তবে আমার সে অন্যায় কাজে তিনি যে মোটেই রাগ করেন নি, তার প্রমাণ পেয়েছি স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি স্নানের ঘরে ঢুকে তাঁর ধুতির খানিকটা জায়গা ধুচ্ছেন। আমিও ঠিক সেই

সময় কি কারণে সেদিকে গিয়ে তাঁকে দেখে অবাক হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়েছি। আমাকে দেখে সলজ্জমুখে তিনি বললেন, 'দেখ তো, কি মুস্কিল! আমার মাত্র একখানাই ধুতি। তাও আবার কাদায় ভরে গেল।' তাকিয়ে দেখি তাঁকে শেষ সময়ে পরানো আমার সেই ধুতিখানাই তিনি সযত্নে ধুচ্ছেন।

ঘুমটা আমার ভেঙে গেল। স্বপ্নের কোন অর্থ আছে কি না জানি না। তবে মনে হয়, আমি যে অন্য কাউকে না দিয়ে চার পাঁচ বছর ধরে তাঁর ধুতি রেখে দিয়েছি শুধু ভেবেই তাঁর আত্মা কষ্ট পেয়েছে। তাই স্বপ্নের ভিতর দিয়েই তিনি আমার এতকালের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

সংসারের কাজ নিজের হাতে করতে আমি চিরদিনই ভালবাসি। কিন্তু সেই অবস্থায় বন্ধুদের সামনে বের হলে কবি খুবই বিরক্ত হতেন। তিনি মনে করতেন যে তাতে তাঁদের সঠিক অভ্যর্থনা বা আদর আপ্যায়ন করা হয় না।

ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একদিন সকালের দিকে বালতি করে জল নিয়ে আমি বারান্দা ধুচ্ছি, ঠিক সেই সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। আমার শাড়ি বেশ খানিকটা ভিজে গিয়েছে–ডান হাতে ঝাঁটা। চাকরটি অন্য কাজে আটকা থাকাতে আমি সেই অবস্থাতেই দরজা খুলে দিতে গেলাম।

দরজা খুলেই কিন্তু আমাকে আড়ালে সরে যেতে হল। কারণ, ভিতরে ঢুকলেন কবিবন্ধু অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেববাবু। ততক্ষণে কবিও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যে খুবই বিরক্ত হয়েছেন সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। অথচ বন্ধুদের সামনে আমাকে কিছু বলতেও পারছিলেন না। চাকরতে ঝাঁটা বালতি সরিয়ে নিতে বলে আমি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

তাঁরা চলে যাবার পরে কবি খুব দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বললেন, 'তুমি যে কি কর! বন্ধুবান্ধব মহলে আমার মানসম্ভ্রম আর থাকল না। অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেববাবু আজ তোমাকে ঠিক কি ভেবে গেলেন।'

'তা কি করব বল? আমি তো জানতাম না যে তোমার বন্ধুরা আসবেন। জানলে কি আর ঝাঁটা হাতে তাঁদের সামনে যাই। কিন্তু

আমাকে কি ভাবলে তো তোমারই ডিসকোয়ালি ফিকেশন'–আমি উত্তর দিলাম।

তিনি কথাটার অর্থ ধরতে না পেরে অবাক হয়েই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন আমি হাসতে হাসতেই বললাম, 'তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। বুদ্ধদেববাবু তো আমাকে বিয়ের সময়ই দেখেছেন, সুতরাং আমি যে বেশেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে চিনবেন বলেই মনে হয়। আর অচিন্ত্যবাবুর বাড়ির মেয়েরাও সংসারের কাজ করে থাকেন। তাছাড়া–তাঁকে তো রসিক বলেই জানি। কবি-জায়ার বদলে আমাকে ঝি ভাবলে ঠিকই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেন 'এই রকম ঝি কোথায় পেলে?'

সেদিন তিনি এমন জব্দ হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে এ প্রশ্ন আর কোনদিনই তোলেন নি।

প্রখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। কবি তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে আবার একদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন।

কবি বাড়িতে আসা মাত্রই আমি তাঁকে প্রেমেন্দ্রবাবুর কথা জানালাম। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সভয়ে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ, আমি বাড়ি থাকতেই ঝাঁটা হাতে আমার বন্ধুদের সামনে যেতে তোমার বাধে না, আর আমার অনুপস্থিতিতে প্রেমেনবাবু এসেছিলেন, তাঁর অবস্থাটা বুঝতেই পারছি। হয়ত বঁটি হাতেই হাজির হয়েছিলে।'

এত অতর্কিতে কবির পৃথিবীর মায়া কাটাবার নোটিস জারি হবে–সে কথা প্রেমেনবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রতিশ্রুতি রাখতে হয়তো তিনি এসেছিলেন, কিন্তু কবিকে ফুলের সাজে খাটে শোয়া অবস্থায় দেখে হয়তো নীরবেই ফিরে গিয়েছিলেন।



কবি ছিলেন ছাত্র-দরদী। ছাত্ররাও তাকে অন্তরের সঙ্গেই শ্রদ্ধা করত। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও আমি তাঁর ছাত্র-প্রীতি লক্ষ করেছি।

আমি যখন ব্রজমোহন কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, কবি তখন সেই কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে ছিলেন। সেবারে হোলি উৎসবে কয়েকজন ছাত্র তাঁকে আবির দিয়ে প্রণাম করতে এসেছিল। সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়েই তাঁকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন আমার ঘরে ঢুকে বলল, 'আপনাকে রং দেব।'

আবির জিনিসটা আমি একেবারেই পছন্দ করি না, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না।' পাশের ঘরেই আমার শ্বশুরমশাই শুয়েছিলেন। তিনি ছেলেটিকে বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢোকার জন্য কঠোর ভাবেই তিরস্কার করলেন। ফলে, সে রং না দিয়েই চলে যেতে বাধ্য হ'ল। পরে অবিশ্যি শুনেছিলাম যে অন্য ছেলেরাও তার এই ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়েছিল।

কবি কিন্তু একটি কথাও বলেন নি। ছেলেরা চলে যেতেই আমাকে বললেন, 'হোলির সময় রং দেওয়াটা আমাদের দেশে একটা রীতি। এইদিনে ছাত্ররা অধ্যাপকদের বাড়িতে গিয়ে আবির দিয়ে সস্ত্রীক তাঁদের শ্রদ্ধা জানায়। তোমাকে ঠিক সেইভাবেই দিতে এসেছিল। স্নান করলেই তো রং উঠে যেত। তুমি এত বিরক্ত হলে কেন?'

তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না ঠিকই, কিন্তু ছাত্রের অপমানে তিনি যে ব্যথিত হয়েছেন, সেটা খুব ভালভাবেই বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি 'দাসগুপ্ত' না লিখে শুধু 'দাশ' লেখাতে তফসিলী সম্প্রদায়ের বহু ছাত্র এসে তাঁকে বলত, 'স্যার, আমাদের সমাজে আপনার মত

এইরকম একজন প্রতিভাশালী লেখক ও সহৃদয় অধ্যাপক পেয়ে আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিটি নরনারী ধন্য হয়ে গিয়েছে।'

কবি কোনও উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন। আমি রাগ করলে বলতেন, 'দেখ, আমাকে সমগোত্রীয় ভেবে কেউ যদি ভুল করেও মনে আনন্দ পায়, তবে সে ভুল ভাঙ্গবার দরকার কি? কারো জন্যে কিছুই তো করতে পারি না। তারা নিজে থেকে যদি একটু আনন্দ পায় তো পাক না।'

১৯৪৬ সনের শেষদিকে তিনি স্বরাজ পত্রিকায় ছিলেন। সেই সময়কার একটি ঘটনা বলছি।

একদিন দুপুরের দিকে তিনি ক্রীক রো দিয়ে ফিরছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন রাস্তার লোকেরা দৌড়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে, এবং প্রতিটি বাড়ির জানালা দরজা দুম্‌দাম শব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন–একটা মিলিটারী ট্রাক ছুটে আসছে। ট্রাকটা এসে তাঁর সামনেই থেমে পড়ল। একজন অফিসার নীচে নেমে বন্দুকের নলটা কবির বুকের সামনে ধরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর য়্যু এ হিন্দু?'

কবি উত্তর দিলেন, 'ইয়েস।'

অফিসারটি বন্দুক ধরে থাকা অবস্থাতেই বললেন, 'আই থিংক য়্যু আর দ্য রিংলীডার অফ দিস এরিয়া। যাস্ট গেট অন্।'

কবি চিরদিনই ধীর স্থির প্রকৃতির সুতরাং তিনি আর একটি কথাও না বলে ট্রাকে উঠে দেখলেন তাঁর মত আরও কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোককে আগেই ধরে আনা হয়েছে। তাঁরাও চুপচাপ বসে আছেন। কবিকে উঠিয়ে নিয়ে ট্রাকটি বহু জায়গা ঘুরে একটি থানায় এসে থামল। সেখানে পৌছে একখানি বেঞ্চে সকলকে বসিয়ে রাখা হল।

'কতক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে' একজন ভদ্রলোক একথা জিজ্ঞাসা করাতে কয়েকজন কনস্টেবল অভদ্র ভাষায় উত্তর দিল, 'যতক্ষণ ও-সি না আসেন, চুপ করে বসে থাক।'

সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ সমস্ত পুলিস শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল এবং অন্যান্য সকলকেও উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করল। কবি তাকিয়ে দেখলেন একটি অল্পবয়সী মুসলমান ছেলে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি যতই সামনের দিকে এগোচ্ছে ততই ঘন ঘন অবাক হয়ে কবির দিকে তাকাচ্ছে। যখন প্রায় কাছে এসে পড়েছে, তখন এক ছুটে এসে কবির

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'এ কী! স্যার আপনি এখানে এ অবস্থায় কেন?'

কবি একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, 'আমি তো তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না।' তখন ছেলেটি দারুণ অভিমানভরে বলল, 'আমি আপনার বি এম (বরিশাল) কলেজের ছাত্র, আর আপনি আমাকে চিনতেই পারলেন না?'

কবি তখন অপ্রস্তুত হয়ে সস্নেহে তার গায়ে হাত রেখে বললেন, 'সত্যি আমার পক্ষে তো এটা অন্যায়ই। তা, তুমি এখন কি করছ?'

'আমি এখানকার ও-সি।' কবি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে লজ্জিত মুখে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, আপনি এখানে কেন, সে কথার উত্তর তো আমি পেলাম না।'

কবি তখন অফিসার এবং কনস্টেবলদের সব কথাই বললেন। সমস্ত শুনে ছেলেটি তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যে যেমন অবস্থায় আছ, বসে থাক। আমি এসে তোমাদের ব্যবস্থা করছি।' তারপর কবির দিকে ফিরে বলল, 'আসুন স্যার আমার সঙ্গে।' এই কথা বলেই সযত্নে এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে হাত ধরে তাঁকে নিয়ে চলল। নানা রাস্তা ঘুরে অবশেষে নিরাপদ স্থানে এসে তাঁকে ট্রামে তুলে দিয়ে আবার ভক্তিভরে প্রণাম করে বলল, 'স্যার, আপনার অসম্মান করে ওরা যে আজ কতবড় অপরাধ করেছে–সেটা বুঝবার মত শক্তি হয়তো ওদের কোনদিনই হবে না। কিন্তু আমি আজ ওদের সকলের হয়ে বারবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। সব দোষ ত্রুটি আমার জন্যই হয়েছে ধরে নিয়েই আপনি আমাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা করবেন।'

যদি তার আবার কোনও বিপদ ঘটে সেজন্য কবি তাকে ট্রামের সামনে আসতে বারবার বারণ করেছিলেন। কিন্তু সে হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিল, 'আপনার আশীর্বাদে কোন বিপদই আমার ধারে কাছে আসতে পারবে না। কিন্তু আজ যদি আপনি ঠিকভাবে বাড়ি পৌঁছতে না পারেন তাহলে নিজেকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারব না।'

রাত্রে কবি যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল তাঁর মনটা যেন সেই ছেলেটির কাছেই চলে গিয়েছে। ছাত্রের এই মহানুভবতার কথা কবি কোনদিনই ভোলেননি–ভুলতে পারেননি। সে রাতে তিনি নীরবে যে তার সুখ, শান্তি এবং দীর্ঘজীবন কামনা করে বারবার তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছিলেন, সেটা শুধু বুঝেছিলাম আমি।

তাঁর এক লাইন কবিতা পাবার আশায় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে প্রতিদিন দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে আসতে দেখেছি। সকলে কিন্তু হাসিমুখেই ফিরে যেত। কিছু বললেই উত্তর দিতেন, 'এরাই তো আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা। এদের ভিতর দিয়েই তো আমি বেঁচে থাকব। এদের কি ফেরাতে পারি?'

এই আন্তরিকতা এবং স্নেহের বিনিময়ে ছাত্র এবং ছাত্রসম অন্যান্য কিশোর এবং যুবকদের অন্তরতম প্রদেশে তাঁর আসন দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

একবার কোনও এক জায়গায় কবির স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির কথা ছিল। তাঁর সেদিন শরীরটা খুবই খারাপ ছিল। তিনি সজনীবাবুকে (সজনীকান্ত দাস) অনুরোধ জানালেন যে তাঁকে যেন আবৃত্তির কাজটা প্রথম দিকেই সেরে নিতে দেওয়া হয়। সজনীবাবু চটে গিয়ে বললেন, 'আপনি তো বেশ লোক মশাই। আপনাকে প্রথমদিকে আবৃত্তি করতে দিয়ে শেষে আমি চেয়ার বেঞ্চ নিয়ে বসে থাকি।' শেষে হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না জীবনানন্দ বাবু, আমি জানি যে আপনার কবিতা শোনার পরে ছাত্রদলকে কিছুতেই আর আটকে রাখা যাবে না। সুতরাং আপনাকে আজ একটু কষ্ট করতেই হবে।'

আহত অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শয্যা নেবার পরে দেখেছি তাঁর সেবা করবার জন্য তরুণ বয়সী ছেলেদের সে কি আগ্রহ। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার হোস্টেলেও থাকতেন। কিন্তু সেখানকার নিয়মকানুন, উপরওয়ালাদের রক্তচক্ষু, পাঁচিলের উচ্চতা–কোন কিছুই তাদের আটকাতে পারেনি। তারা ঠিক সময়েই ছুটতে ছুটতে কবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ তাঁর আত্মা যেখানেই থাকুন না কেন, এই সব ছেলেদের আশীর্বাদ তিনি করছেন বৈকি, নিশ্চয়ই করছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে সকলে কতটা আনন্দ পেতেন তাঁর প্রমাণও যথেষ্ট পেয়েছি। তাঁর সেবারতা সিস্টার শান্তিদেবীর কথা আমার আজও মনে আছে– এবং চিরদিনই থাকবে। জীবিকার্জনের জন্য টাকা তাঁকে নিতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর সেবার মধ্যে যে দরদ, যে আন্তরিকতা আমি দেখেছি, তা শুধু টাকার বিনিময়ে কোনদিনই পাওয়া যায় না। কত সময় তিনি আমাকে বলেছেন, 'বউদি, এই রকম দাদার সেবা করার সৌভাগ্য যে আমার কখনও হবে, সে কথা

আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি।' কবির মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পরে শান্তিদেবীও চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন। অন্তরের অনেকখানি টান থাকলে তবেই এ কাজ সম্ভবপর হয়।

কবির বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতিঘেরা বরিশাল। সেখানে দেখেছেন তিনি হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব ভ্রাতৃরূপ। দুঃখে, বিপদে, একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে–স্নেহ, ভালবাসায় হয়ে উঠেছে অতি আপনজন। এমনিই ছিলো তাদের একাত্মবোধ।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে একই মায়ের কোলে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, তাদের সে রক্তের হোলিখেলা, বেদনায় মূক করে তুলেছিল কবি-চিত্তকে–বিকল করেছিল তাঁর প্রাণ। অন্তরের সে ব্যথা–সে বেদনাকে মুখে প্রকাশ করার ভাষা তিনি খুঁজে পাননি। তাই লেখনীর বাহুডোরে বেঁধে রেখে গেলেন ভাবীকালের সন্তানদের পথ দেখাবার জন্যে–

প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে...
মানুষ খেয়েছি আমি–তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহতভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ-প্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি–তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে...
ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে। 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ-মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ–
আর তুমি? আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে–রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;

মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর
কোথাকার কেবা জানে;...
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছেঃ
কেউ নেই, কিছু নেই–সূর্য নিভে গেছে।

ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে–এখানকার শোভা সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখবার জন্য, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্যই সে পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু সব কিছুই তার কাছে ব্যর্থ বলে মনে হয় কেন? জীবনকে বোঝা মনে করে তাকে দূরে ফেলে দেবার জন্য কেন সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে?

এই সব চিন্তা কবি-মনে উদিত হয়েছে লাসকাটা ঘর দেখে। বরিশালের অযত্নে, অবহেলায় পড়ে থাকা লাসকাটা ঘর। মানুষের অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে কেন লজ্জানত শিরে নীরবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়ার বুক ভরা ভালবাসার, শিশুর অনিন্দ্যসুন্দর হাসি, খ্যাতি, মান, প্রতিপত্তি–জীবনের পরিতৃপ্তি, সব কিছুই হেলায় ঠেলে ফেলে দিয়ে এ হেন ঘরে গিয়ে যে মানুষ তার বুকের জ্বালা জুড়াতে চায়, দূর করতে চায় তার অবসাদ–অপরিসীম ক্লান্তি–কি তার ব্যথা! কোন্ সে মর্মন্তুদ দুঃখ!

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে!
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে–ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ;
বধূ শুয়েছিলো পাশে–শিশুটিও ছিলোঃ
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো–জ্যোস্নায়–তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল–লাসকাটা ঘরে
শুয়ে ঘুমায় এবার
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি?
কোনদিন জানিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম–অবিরাম ভার

সহিবে না আর–
জীবনের এই স্বাদ–সুপক্ক যবের ঘ্রাণ
হেমন্তের বিকেলের
তোমার অসহ্য বোধ হলো ঃ
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে–গুমোটে
থ্যাঁতা ইদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

কিন্তু নারীর প্রেম, শিশুর ভালবাসা, কীর্তি, সম্পদই কি আমাদের জীবনকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়? না–তাহলে? তাহলে কোন্ সে বিস্ময়কর অনুভূতি যা আমাদের রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, মজ্জায় মিশে থেকে আমাদের দিশেহারা করে তোলে।

জানি–তবু জানি
নারীর হৃদয়–প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়–
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত–ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে।
সেই ক্লান্তি নাই ঃ
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিত হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।...

কিন্তু শেষে হয়ত কবি উত্তর খুঁজে পেয়েছেন।

আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে
যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।...

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর কথায় মৃত্যু পার হয়ে বেজে উঠল জীবনের জয়ধ্বনি।

কবি ছিলের প্রকৃতির পূজারী। উদার নীল আকাশ, কাশের বন, হিজলের, নারকেলের সবুজ পাতা তাঁকে হাত ইশারায় ডাক দিত। সূর্যের প্রথম আলোকরেখাটি যখন আকাশের বুকে সোনালি রং এঁকে দিত অথবা তাঁর অতি আদরের অজস্র ফুলে ভরা গন্ধরাজ ফুলের গাছটিকে রং-এ ভরিয়ে তুলত, কবি তখন বাগানে একখানি ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় সেই সৌন্দর্যনেশায় বিভোর হয়ে থাকতেন। কখনও বা সুদূর দিগন্তের পানে অবাক দৃষ্টি মেলে ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রতেন–

রৌদ্র-ঝিলমিল
ঊষার আকাশ,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে বারে।

এই সৌন্দর্যের অনুভূতিই নানাভাবে নানা ছন্দে রূপ নিয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। এই অনুভূতির পথ ধরে চলতে চলতেই চিনতে পেরেছিলেন তিনি শ্যামলা, কোমলা, অপরূপা বাংলা মায়ের নিজস্ব রূপটিকে। তাই তো তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল–

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ
অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছ
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি–
চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপঃ
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।

সন্ধ্যেবেলা স্টিমার, লঞ্চ এমন কি নৌকার ক্ষুদ্র আলোক শিখাটিও যখন ঢেউয়ের গতিছন্দের সঙ্গে তাল রেখে ছোট্ট নদীটির বুকে শিহরণ জাগাত, তখন সেই লহরীর নৃত্য দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। কচি নরম ঘাসের পরে বসে, তারার মেঘলা পরা রাত্রির শান্ত,

উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তব্ধ ধ্যানে মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়েছেন।

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি, কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মত
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে–আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা–কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে,
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোন পথ এ কন্যারে দেখেনিকো–দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে
পৃথিবীর কোন পথে...

বাংলা মায়ের যে কয়জন সন্তান বিশ্বের দরবারে মায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, কবি জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম, যশোলক্ষ্মী যখন জয়গৌরবের মালা হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন–ঠিক সেই সময়েই হেমন্তের কবি হেমন্তেরই এক কুয়াশা ঢাকা রাতে চিরদিনের মতই হারিয়ে গেলেন–হারিয়ে গেলেন রহস্যময় রাজপুরীর সোপানাবলী ধরে কোন এক অন্ধকার গুহাকক্ষে। রং-এ, রসে, স্বপ্নে ভরা এই পৃথিবী। চোখে তার মায়ার কাজল। কিন্তু মহাকালের ডাক যখন আসে, তখন ধরিত্রী মায়ের বুক খালি করে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে আমাদের পড়তেই হবে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা সব কিছুই মায়াবী মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত চিন্তা ভাবনার পরিসমাপ্তির রেখা টানতেই হয়।

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে,
চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো
এসে জাগে
ধুসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে
স্বপ্ন ছিলো–সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোন্ মায়াবীর
প্রয়োজনে লাগে।...

কিন্তু মাটি-মা? মাটি-মা তো সেকথা শুনতে চায় না–বুঝতেও চায় না। সন্তানকে স্নেহডোরে বেঁধে রাখার জন্য তার সে কি আকুল প্রচেষ্টা। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে সেটুকু মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন কবি–

আমার এ শিরা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন–
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা–তোমায়;
ডেকেছিলো ভিজে ঘাস–হেমন্তের
হিম মাস–জোনাকির ঝড়,
আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ...

* *

নয়ন মুদিনু ধীরে–শেষ আলো নিভে গেল
পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য-প্রসূতির মাতা অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।...

কিন্তু বাংলার কবি–বাংলার মাটি, জল, বাংলার স্নেহনীড় ছেড়ে বেশীদিন দূরে থাকতে পারবেন না। পারবেন না তিনি হিজলের, অশ্বত্থের সবুজ আভা ছড়ান বন, বেলকুঁড়ি ছাওয়া পথ, স্নিগ্ধ মলয়-হিল্লোলিত কাশের বন, আর কোকিলের কুহুতান ছেড়ে দূরে থাকতে। তাই তো তিনি সকলকে বার বার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন–

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে–এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়–হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এই কাঁঠাল-ছায়ায়;

* *

হয়তো বা হাঁস হবো–কিশোরীর–ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে-ভেসে

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

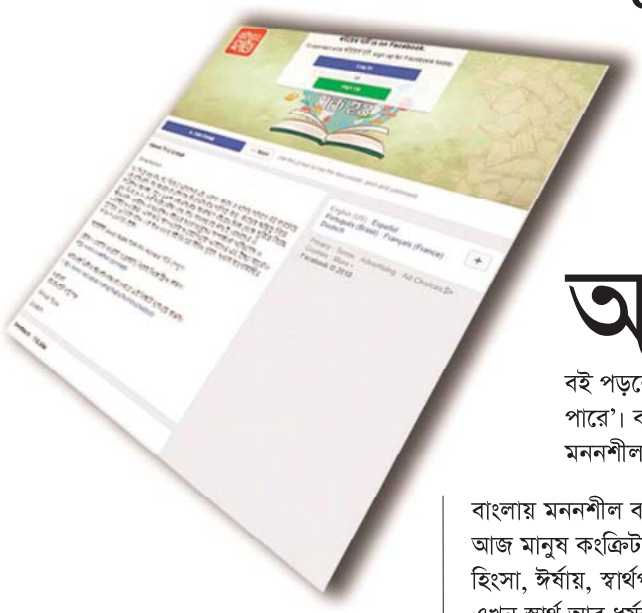
* *

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলাজলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকার আসিতেছে
নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ঃ আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

সমাপ্ত

অনলাইন যোগাযোগের যুগান্তকারী পরিবর্তনে বইয়ের প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পাঠযজ্ঞে বাংলা বই যেন ব্রাত্য। একদল বাংলা বইপ্রেমী অনলাইন বাংলা বই পঠন-পাঠনে বিপ্লব সাধন করেছে। ২০১২ সালে 'বইয়ের হাট'-এর যাত্রা শুরু। আজ সারা বিশ্বে ১২০,০০০ বইপ্রেমী এর সদস্য। ৬০,০০০-এর বেশি বই অনলাইনে। সেই চমকপ্রদ গল্প শুনুন অন্যতম পরিচালক **এমরান হোসেন রাসেল**-এর কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও
বইয়ের হাট



আমরা বলি 'বই পড়লেই মানুষ মননশীল হয়।' বলা উচিৎ 'মননশীল বই পড়লে মানুষ মননশীল হতে পারে'। বইয়ের হাট হলো এমনই মননশীল বইয়ের আধার। শুধুমাত্র বাংলায় মননশীল বইয়ের আধার।

আজ মানুষ কংক্রিটময় পৃথিবীতে যান্ত্রিকতা, হিংসা, ঈর্ষায়, স্বার্থপরতায় কাতর, জীবন-দর্শন এখন স্বার্থ আর ধর্ষণের প্রবৃত্তির কাছে পর্যুদস্ত, সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রীয় আঙিনা পেরিয়ে গ্রাম্য কুটিরে, ধর্মগুলো আত্মোন্নয়নের খোলস ছেড়ে অপরাধের বর্ম। এমন দুঃসময়ে মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

যখন রাষ্ট্রনায়কের হীন স্বার্থে ফরমায়েশি অছিয়তনামা হয় ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে বলা হয় উন্নয়ন, কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কলহাস্যমুখর কৈশোর ধর্মীয় উন্মাদনায় বা টিকে থাকার অসম প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়, প্রকৃতির উদার উপহার সবুজ বনানি কেটে তৈরী হয় পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ঘরের বাইরে বের হলে ঘরে-ফেরা অনিশ্চিত– তখন মানুষকে মানবিক হতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

সাহিত্য মানুষকে ভেতর থেকে গড়ে তোলে, এটাই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; মানব মনের ভেতরে প্রণোদনার সৃষ্টি করে। 'সবকিছুর পরেও যে জীবন অমূল্য জিনিস'– এই বোধ জন্মাতে, জন্মানো বোধে শান দিতেই সাহিত্য।

জগতের ছড়িয়ে থাকা ইন্টারনেট-সেবী বাঙালি আর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বাংলা বইয়ের মেলবন্ধন বইয়ের হাট। সাহিত্য নিয়েই বইয়ের হাট-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড; নির্দিষ্ট করে বললে ভিন্ন-ভাষার সাহিত্য বাংলায় অনূদিত এবং বাংলা-সাহিত্যের আধারই বইয়ের হাট। সাহিত্য বুঝতে হলে বিজ্ঞান, অংক, দর্শন, সংগীত, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পুরাণ, মিথের উপযোগিতা অপরিহার্য, বইয়ের হাট-এ এসব বিষয়ভিত্তিক বইয়ের চর্চা হলেও সাহিত্যই প্রধান। মূলত বই দেওয়া-নেওয়া দিয়ে শুরু হলেও, বইয়ের হাট এখন সাহিত্য-নির্ভর আরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

ফেসবুকে বাংলা-ভাষী সাহিত্যপ্রেমীদের গ্রুপরূপে বইয়ের হাট-এর পথ চলা শুরু। ২০১২ সালের ২৮সেপ্টেম্বর রিটন খানের হাতে বইয়ের হাট ফেসবুক গ্রুপটির সৃষ্টি। গ্রুপ তৈরি হলো বটে কিন্তু তেমন একটা সক্রিয় হলোনা। ২০১৫ সালের জানুয়ারির দিকে আমার সাধারণ সদস্য হিসেবে বইয়ের হাটে যুক্ত হওয়া। তখন মাত্র ১,০০০ কি ১,২০০ সদস্য নিয়ে গ্রুপ, পরিচালকদের মধ্যে রিটন খান ছাড়া তেমন কেউ সক্রিয় ছিলেন বলে মনে করতে পারি না। সম্ভবত ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে রিটন খান ছাড়া আগের সব পরিচালক পরিবর্তন হয়ে পল্লব সরকার (ফেসবুকে 'শিশির শুভ্র' নামে পরিচিত)-কে নিয়ে নব কলেবরে পরিচালনা পর্ষদ গঠন হয়। শিশিরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে দেখেছি। তার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে ছেলেটির সারাদিনের একমাত্র কাজ গ্রুপ চালানো, এর বাইরে অন্য কোন কাজ



এমরান হোসেন (রাসেল) -এর সম্পাদনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসা, প্রেম নয়', বেলাল চৌধুরীর 'নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়' বৈদ্যুতিন সংস্করণ ও ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মজীবনী 'প্রকাশিত হয়েছে।

নেই। গ্রুপে সদস্য ক্রমে বাড়তে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুক পছন্দ না, কিন্তু এই বইয়ের হাটের নেশায় প্রথম প্রথম দিনে দশ-পনের মিনিটের জন্য এক-আধবার, পরে দিনে দু'তিন ঘন্টা কেটে যেতে লাগল। নতুন নতুন বন্ধু হলো। বইয়ের আদান-প্রদানের সাথে সাথে, বিচিত্র অথচ মনোগ্রাহী সব তথ্যের কারণে অবসর পাওয়া মাত্রই বইয়ের হাট-এ চলে আসি। অনেক নতুন লেখকের লেখার সাথে পরিচিত হতে থাকি; অল্প-সল্প পড়া অনেক লেখককে বিস্তারিত জানতে, তাঁদের লেখা পড়তে বইয়ের হাট সুযোগ করে দিতে থাকে। যেখানে ২০১৫ সনের জানুয়ারীতে প্রতি পোস্টে সদস্যদের সক্রিয়তা অতি নগণ্য, সেখানে ২০১৫ সনের মাঝামাঝি গিয়ে সক্রিয়তা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখা গেল।

সম্ভবত ২০১৫ সনের আগস্ট মাসে কোন একদিন– তখন গ্রুপে সদস্য সংখ্যা বড়জোর দু'হাজার কি দু'হাজার দু-একশ'; সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিটন খানের নোটিফিকেশন: 'আপনাকে বইয়ের হাট গ্রুপে এ্যাডমিন করতে চাই, আপত্তি থাকলে জানান' এবং এর পরের নোটিফিকেশনটাই এ্যাডমিন হয়ে যাওয়ার । ততদিন গ্রুপটাকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছি, গ্রুপের বহু বন্ধু-বান্ধবের (ফেসবুক-বন্ধু) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি–সবই বই সম্পর্কিত নানান বিষয়ে। গ্রুপে ঢুকে দেখলাম আমার মত আরো দু'জন নতুন পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। একজন মলয় দেবনাথ, অন্যজন মালিহা নাজরানা। কীভাবে গ্রুপ চালাতে হয়, সদস্য নির্বাচন কীভাবে করতে হয়, পোস্টগুলো অনুমোদন দেওয়ার ভিত্তিই বা কি – কিছুই জানি না। তখনই যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সে রাতেই সবার সাথে মেসেঞ্জারে পরিচয় ও আলাপ হলো– ধীরে ধীরে সবকিছুই জানা হয়ে গেল, বলা যায় বইয়ের হাটের আসক্ত হয়ে গেলাম।

অল্পকিছু দিন হলো চার নতুন মুখ বইয়ের হাটের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন: সুমন বিশ্বাস, নায়লা নাজনীন, মধুমন্তী সাহা আর দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী। আচ্ছা, একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি – গ্রুপের সব কর্মকাণ্ডই বাংলা-সাহিত্যকে ভালোবেসে আর স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। গ্রুপ আজ এক লক্ষ বাইশ/তেইশ হাজার বাঙালির প্রাণের স্থান, যেখানে প্রতিদিন গড়ে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বাঙালি পদচিহ্ন রাখেন; কোন কোন দিন আরো বেশি। এই কর্মযজ্ঞে প্রত্যেক পরিচালক তাঁর দৈনন্দিন জীবন থেকে সময় বের করে হাসিমুখে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে গ্রুপকে সচল রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছেন। এই মহতী কর্মকাণ্ডে আরেক জন নিরলস, হাসিমুখ আর প্রাণবন্ত মানুষ আছেন, যিনি পরিচালকমণ্ডলীর বাইরে থেকেও গ্রুপকে সন্তানের মত ভালোবাসেন, তিনি আশফাক স্বপন। তাঁর স্বেচ্ছাশ্রম আর বৌদ্ধিক ভাবনা গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

২০১৬ সাল – গ্রুপে তখনও প্রতিদিন বই আদান-প্রদানই প্রধান আর একমাত্র কাজ। সাধারণ সদস্য থাকা অবস্থায় অনেককেই রোমান হরফে বাংলায় মন্তব্য করতে, পোস্ট করতে দেখেছি। অথচ বইয়ের হাট বাংলা বইপ্রেমী একটি গ্রুপ, যেখানে সবার বাংলা বই নিয়েই যত সব কার্যক্রম সেখানের অবস্থাটি এমন– কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। সদস্যদের বাংলা বর্ণে লেখার অনুরোধ করা শুরু করলাম; এই কাজে অনেকেই সহমত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সদস্য– 'বন্দন কুমার বড়ুয়া' অন্য সবার চেয়ে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে এলেন। কীভাবে কম্পিউটারে/মোবাইলে বাংলা লিখতে হয় তিনি এমন একটি ডক তৈরি করলেন। শুধু তাই না। তিনি প্রায় পোস্টে গিয়ে বেহায়ার মতো যাঁরাই রোমান হরফে বাংলায় পোস্ট বা মন্তব্য করেন তাদের বাংলা বর্ণে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা শুরু করে দিলেন, এতে অনেকেই কম্পিউটারে/মোবাইলে বাংলা বর্ণ লেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাজ হলো বটে– সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়; বাংলা টাইপ করা তো শুরু হলো কিন্তু অনেকেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার জানেন না বা ভুলে গেছেন। হায়াৎ মামুদ মহাশয়ের বহুল চর্চিত 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' বইটি থেকে যুক্তবর্ণের ব্যবহার, কোন কোন বর্ণ মিলে কোন যুক্তবর্ণ হয় ইত্যাদি গ্রুপে প্রতিদিন একটি করে পোস্ট দিয়ে গেলে অনেকেরই বাংলা টাইপে স্বচ্ছন্দ ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েন । একটা সময় এমন দাঁড়াল যে, গ্রুপের সদস্যরা বাংলা ভিন্ন







(ওপরে) কথাসাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খান। বইয়ের হাটের অন্যান্য পরিচালক (বাঁয়ে, বাঁ থেকে) দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, সুমন বিশ্বাস; (নিচে, বাঁ থেকে) মধুমন্তী সাহা, এমরান হোসেন রাসেল, পল্লব সরকার ও নায়লা নাজনীন।







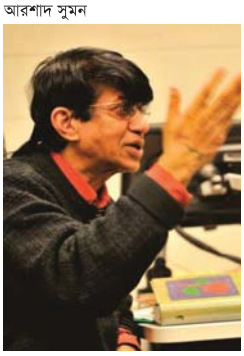




আরশাদ সুমন

জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বইয়ের হাটের সাহিত্য-বিষয়ক ওয়ার্কশপে আলোচনারত ডঃ আজফার হোসেন ও অংশগ্রহণকারীরা। জর্জিয়া টেক-এর বাংলাদেশি ছাত্র সমিতি ওয়ার্কশপ আয়োজনে সহায়তা করে।

আরশাদ সুমন



আরশাদ সুমন





আরশাদ সুমন

(ওপরে, বাঁয়ে) কাজী নজরুল ইসলাম-এর ওপর বইয়ের হাটের সাহিত্য ওয়ার্কশপ-এ বক্তৃতারত অধ্যাপক আজফার হোসেন। (ওপরে, ডানে) ওয়ার্কশপে আলোচনারত অংশগ্রহণকারী (বাঁ থেকে:) খালেদ হায়দার, নিশি জাফর, নাহিদ হায়দার ও সৈয়দ নাসিম জাফর। (নিচে) সারাদিনব্যাপী ওয়ার্কশপে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খানে (সর্বডানে) এবং অধ্যাপক আজফার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

অন্য বর্ণ বা হরফে মন্তব্য করা ছেড়ে দিলেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বইয়ের হাট শুধুমাত্র বাংলা বই আদান-প্রদানের ছাড়াও ভিন্ন কিছু করার প্রয়াস পায়।

এতক্ষণ নিজের সম্পৃক্ততার কথাই বললাম; এখন বইয়ের হাটের কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বলি। তখনও গ্রুপে বই দেওয়া-নেওয়াই প্রধান কাজ। ২০১৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলায় বইয়ের হাটের কিছু সদস্য নিয়ে পরিচালকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে একত্র হওয়ার চেষ্টা করি। অনেকেই আসবেন জানালেও, শেষে আগ্রহীদের উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য। তবে যে কয়জন বন্ধু এসেছিলেন প্রাণ খুলে মত বিনিময় হয়েছে; প্রত্যেকের চোখ-মুখে বইয়ের হাটের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ঠিকরে পড়ছিল। মিলনটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘাসে বসে সামান্য কফি পানে উদ্‌যাপিত হলেও, একটি বার্তা নিয়ে এলো– এখন আমাদের ইন্টারনেটের বায়বীয় জগৎ থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতে কিছু করতে হবে।

এই ভাবনাটি বাস্তবায়ন করতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নিতেই প্রায় দেড়-দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে আমরা একটি সাহিত্য-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাথে মিলে কাজ করতে গিয়ে সেখানে সময় ব্যয় করে ফেলি। তবে সেই সময়ে কিছুই যে হয়নি এমন নয়– লেখক স্বত্ব নেই এমন প্রচুর বইয়ের ই-পাব করা হয়েছে; শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে 'শিশু -কিশোর ডট অরগ' নামে একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে, সেখানে প্রচুর বাংলা শিশু-সাহিত্যের সাথে ভিন্ন ভাষার শিশু-সাহিত্যের বঙ্গানুবাদও আছে; 'ই-বাংলাসাহিত্য ডট কম' নামে ক্লাসিক বাংলা-সাহিত্যের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. আজফার হোসেনের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার বইয়ের হাট-এর ব্যানারে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও কবি জ্যোতির্ময় দত্ত এক বৈঠকী-আলাপে বইয়ের হাটকে ভালোবেসে বলেন – 'কিচ্ছু না জেনে কম্পিউটারে দু'চারটি বোতাম টিপলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচলী; রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী; কত অখ্যাত লোকের লেখা; যেসব বই শুধু দূরে থেকে বাঁশি শুনেছি, নাম জেনেছি; তারা এখন আমার ইঙ্গিতে শরীর পাচ্ছেন। এই যুগের সূচনায় আমি যে আছি তাতে সৌভাগ্যবান মনে করি। ...'

আমাদের সফলতার মুকুটে এটি একটি মূল্যবান পালক বলে বইয়ের হাট সশ্রদ্ধচিত্তে মনে করে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলা – বইয়ের হাটের জন্য একটি পয়মন্ত

কাল। ওয়েবজিন 'গল্পপাঠ' সহযোগী 'গুরুচন্ডা৯'-কে নিয়ে নির্বাচিত গল্পসংকলন ১ম ও ২য় খণ্ড বের করে। গল্পসংকলনের ২য় খণ্ডটি বইয়ের হাটের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। অনলাইনে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার মতো কাজে অবদান রাখায় বইয়ের হাটকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয় এবং মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বইয়ের হাটকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বইয়ের হাটের পক্ষ থেকে রিটন খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যিক পরিবার থেকেও বইয়ের হাট সম্মানিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বইয়ের হাটের কর্মকাণ্ড এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় মুগ্ধ হন এবং বইয়ের হাটকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশ ব্যতিত অন্যান্য কিছু বইয়ের বৈদ্যুতিন সংস্করণের অনুমতি প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ৭ই জানুয়ারি বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মিনাক্ষী দত্ত বইয়ের হাটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির দৈনিক 'আজকাল'-এর মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। তিনি বইয়ের হাটের জন্মপূর্ব ইতিহাস সবিস্তারে প্রকাশ করেন, বইয়ের হাটের সংগ্রহকে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা বিশ্ববাসীর জন্য মূল্যবান ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উন্মুক্ত করার কাজে নিয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ'-এর সাথে প্রথম থেকেই বইয়ের হাট যুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক বইয়ের সরবরাহ, স্ক্যান করার মতো কঠিন কাজগুলো করে গেছে। তাঁদের বিভিন্ন লেখা, সাক্ষাৎকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বইগুলো বইয়ের হাটের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে বইয়ের হাট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

এভাবে বইয়ের হাট তার নিজের ছন্দে চলতে থাকল, একসময় দেখলাম অনেক স্বনামধন্য লেখক/কবি/নাট্যকার/প্রাবন্ধিক/অন-লাইন ব্লগার/চলচ্চিত্র পরিচালক/বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠক/ প্রকাশক/প্রচ্ছদ শিল্পীর পদচারণা; এদের অনেকেই গ্রুপে সক্রিয়, অনেকে আবার নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়রা মাঝে মাঝে তাঁদের পোস্ট, মতামত দিয়ে আমাদের প্রভূত সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং মানুষের হৃদদ্বারে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছানোর সহজ-সঠিক পথটি বাৎলে দিয়েছেন।

বইয়ের হাট ২০১৮ সালের ২৪শে মার্চে আটলান্টার জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের ওপর 'কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পসৃষ্টি: বৈচিত্র্য ও আন্তর্জাতিকতা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠান করে, সহযোগিতায় ছিল জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। সমস্ত দিন প্রাণচঞ্চল কর্মশালার প্রাণপুরুষ ছিলেন মিশিগান লিবারেল স্টাডিজ ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজের অধ্যাপক ড. আজফার হোসেন। সকাল-বিকেল দু'ভাগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাটির উৎকর্ষ-ঠিক রাখতে মোট দশজনের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় কর্মশালার খবরটি প্রচারিত হয়। সেই বিবেচনায় একে একে কর্মশালার ভিডিও, পাঠ্য-প্রবন্ধ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে ।

চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন।

২০১৮ সনের মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র আতিথেয়তা গ্রহণ করে বইয়ের হাটকে সম্মানিত করেন। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি সাহিত্য, ভারত-বিভাজন, দু'বাংলার সাহিত্যিক সম্পর্ক, নিজের লেখা এবং পাঠক সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচনা করেন। বইয়ের হাটের লেখক যশোপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন:

'...উপদেশ দেওয়ার অধিকার তো আমার কিছু নেই, আমার যেটা মনে হয় যে, লেখাটা একটা সাধনার জায়গা। একজন লেখককে নিজেকে তৈরী করতে হয়, প্রচুর পড়তে হয়, বারবার লিখতে হয়। আগে যখন আমরা প্রথম বয়সে একটা লেখা কতবার করে লিখেছি, লিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, লেখা ফেরত এসেছে, আবার লিখেছি দাঁতে দাঁত চেঁপে। এই সমস্ত করেই লেখক হয়।'

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে বাঙালি সমাজ এবং বাঙালি লেখক সমাজে আগ্রহ সবসময়ই ছিল; এ বিষয়ে বাদ-বিবাদের কোন রকম কমতি ছিল না, এখনও নেই। বইয়ের হাট আলোচ্য বিষয়ে সুমিত্রা দত্তের লেখা পাঠকপ্রিয় বই 'নতুন বৌঠান, রবীন্দ্রজীবন ও মননে' নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। বৈঠকে বইটির লেখক সুমিত্রা দত্তের মেয়ে শুভশ্রী নন্দী (রাই)– রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, উভয়ের সম্পর্ক, এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোভাব এবং তাঁর মা অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বইয়ের হাট সবসময় এগিয়ে আসতে আগ্রহী । আমাদের এসব আলোচনা আমরা ইন্টারনেটে তুলে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি, আর অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি।

বাংলা বইয়ের এই আধারের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার)-এর মতো বই আছে, গ্রুপের সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে আজ বইয়ের সংগ্রহ এই পরিমাণ। বেশির ভাগ বইয়ের লেখকস্বত্ব বা কপিরাইট আজ আর নেই, সংগ্রহের বিশাল একটি অংশ digital library of india থেকে পাওয়া। গ্রুপের সদস্য এমন অনেক লেখক তাঁর লেখা বই স্বপ্রণোদিত হয়েই গ্রুপে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এমনও ঘটনা আছে যে, লেখক বাবা/মার বই তাঁর ছেলে-মেয়ে গ্রুপে বিনামূ সবার জন্য পাঠোপযোগী করেছেন। ইন্টারনেটে সহজলভ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বাকি বইগুলোর সংস্থান হয়েছে।

এ নিয়েই চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন। মননশীল বই যে মানুষকে মানবিক করে তোলে, তার লক্ষণীয় উদাহরণ আজ বইয়ের হাট। বাঙালির ইতিহাসে এমন মননশীল ক্ষেত্র আরো বহু আগেই প্রয়োজন ছিল, যা বহু দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে এখনও সুস্থ-স্বাভাবিক-ছন্দময় গতিতেই বেগবান রয়েছে। বইয়ের হাটের শুরুটা ইন্টারনেটের বায়বীয় জগতে হলেও, এখন বায়বীয় ও কঠিন বাস্তব উভয়ক্ষেত্রেই সমান গতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। এ সবই সম্ভব হয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলা-সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির ভালোবাসায় আর তাঁদের আস্থায়। আমাদের এমন ক্ষুদ্র প্রয়াস একদিন প্রতিটি বাঙালিকে মননশীলরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবার আগে উচ্চারিত হবে কিনা, সেই উত্তর ভাবীকালের গহ্বরেই থাকল। ■